উপন্যাস

আনিসুল হক

আলো-অন্ধকারে যাই

উপন্যাস

আনিসুল হক

আলো-অন্ধকারে যাই

নটর ডেম কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল বার হবে। রেজাল্ট প্রকাশ হবে জনকণ্ঠ পত্রিকায়। ছোট বোন রুজি গেছে পত্রিকা কিনতে। আম্মা আর আমি বাসার সামনে দাঁড়ায়া আছি। সকালবেলার রোদের রঙ হয় কমলা। আমি চোখে দেখি না বলে সকাল কিংবা সন্ধ্যা আমার কাছে একই। কিন্তু সকালবেলার ঝকঝকে আলোর মচমচে গন্ধ আমি আমার শরীরে টের পাই। যেমন বিকালবেলা পাই রোদ মরে আসার গন্ধ, সেই গন্ধটা বাসি গাঁদাফুলের মতো। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো সাংঘাতিক সক্রিয় ও জোরালো থাকে। এখন বাসার সামনে রুজি আর পত্রিকার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি পাইতেছি সকালবেলার তীব্র আলোর সরষে-তেল-ঝাঁজ।

আমি যেদিন প্রথম গেছলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ডেমরার সারুলিয়ায়, শীতকালের এক সকালে, স্কুলে যেতে হইছিল (হইসিল) একটা চষা ক্ষেতের ওপর দিয়া, পায়ের স্যান্ডালের নিচে শিশির আর ঘাস আর মাটির প্রলেপ পড়ে গেছল (গেসল), আর স্কুলের মাঠের চোরকাটার ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের ডগায় ঝিকমিক করতেছিল (করতেসিল) শিশির, অনেকগুলো ফড়িং উড়তেছিল, লম্বা লেজওয়ালা একটা পাখি উড়ে গেছল মাঠের ওপর দিয়া, আর মাঠে শুয়ে থাকা একটা গরুর গায়ে বসে ছিল কয়েকটা পাখি, সেই সকালটার রঙ আমার কাছে মনে হইছিল রুপালি। সেই সকালটার কথা কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? তখন আমি চোখে দেখতে পাইতাম। তখন শীতকালের বিকালগুলানকে আমার মনে হইত হলুদ। বিকাল তিনটা হইতে না হইতেই ফুটবল হাতে বারায়া পড়তাম, হাফপ্যান্ট পরা একেকটা ছেলে, আর আমাদের ছায়া লম্বা হয়ে পড়ত হলুদ হয়ে আসা ঘাস-বিছানো মাঠে। আর গাছে গাছে পাতাগুলানও শীতের শেষে হলুদ হইতে শুরু করত। তখন আমার দৃষ্টিশক্তি ঠিক ছিল, আর জগৎটা ভরা ছিল রঙে রঙে।

কিন্তু এখন আমি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী আর আমার জগতের একটাই রঙ। কালো।

কালোই আমার সবচেয়ে প্রিয় রঙ। এখন।

স্কুলের প্রথম দিনে খুব কান্দছিলাম। আম্মা আমাকে স্কুলের বেঞ্চে বসায়া রেখে চলে গেলেন বারান্দা দিয়া হেঁটে হেঁটে, চারদিকে সব অচেনা ছেলেমেয়ে বসে আছে, তারাও নতুন, তারা কান্দতে শুরু করলে আমিও তাদের সঙ্গে কান্নার পাল্লা দিতে লাগলাম। আম্মা আম্মা...

আম্মাকে দেখা যাইতেছে ওই দূরে চষা ক্ষেতের ওই পারে দাঁড়ায়া আছেন, বোধ হয় আমাকে চোখে চোখে রাখার জন্যে দাঁড়ায়া আছেন ওখানে, আমি এত বলি, আম্মা, আমাকে নিয়া যাও, আমি স্কুলে পড়ব না...আম্মা শুনতে পাইতেছেন বলে মনে হয় না।

আম্মার পরনে ছিল নীল রঙের শাড়ি, আম্মা আস্তে আস্তে কুয়াশামাখা দিগন্তের মধ্যে ছোট হয়ে যাইতে লাগলেন, আর তিনি হয়ে গেলেন একটা নীল রঙের পাখি, তারপর তিনি নাই...

তখন দুই চোখ ছিল, দুই চোখে দৃষ্টি ছিল, তখন চোখ মেলে দিগন্তে আম্মাকে দেখতে পাইতাম, এখন দুই চোখ আছে, কিন্তু তাতে দৃষ্টি নাই, কিন্তু এখনো আমি আমার আম্মাকে দেখতে পাই, সেই ১০ বছর আগের আম্মা যেমন ছিলেন তেমনি। আমার চোখে আর কেউ বুড়া হবে না, বয়স্ক হবে না, আমার দশ বছর বয়সে যাকে যেমন দেখছিলাম সে তেমনি রয়ে গেছে, আমার বড় আপা আর মেজ আপা এখন কত বড় হইছে, দেখতে কেমন হইছে, তা বাস্তবে আর আমার পক্ষে কোনো দিনও বোঝা সম্ভব নয়, মেজপা অবশ্য দৃষ্টিশক্তি হারাইছেন আগেই, আমার ইমেডিয়েট ছোটটা রত্না, সেও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, ভিজুয়ালি ইমপেয়ার্ড, তবে একদম ছোট বোন রুজি সাইটেড, চক্ষুষ্মতী।

আজ সকালের রঙ কেমন আমি জানি না, শুধু নাকে পাইতেছি রোদের গন্ধ, আর আমার পাশে আমার আম্মা, তার চিরায়ত গন্ধ, আর কণ্ঠস্বর আর স্পর্শ।

রুজি আসছে। আমি তার পায়ের শব্দ টের পাইতেছি। আমি আমার চার বোনের, আব্বার আর আম্মার আর ভাগ্নে-ভাগ্নির পায়ের শব্দ আলাদা করে চিনতে পারি।

আমি বলি, রুজি, পেপার পাইছিস?

জি ভাইজান।

পেপারে রেজাল্ট দিছে?

সেইটা তো দেখি নাই ভাইজান।

দেখো তো। এইটা মেয়ে কী করল। সে রেজাল্ট বার হইছে কি না, দেখে আনবে না।

আম্মা বলেন, দে আমাকে দে।

বারান্দায় উঠে ওরা কাগজের পাতা মেলে ধরছে। খসখস শব্দ পাচ্ছি। আমার রোল লেখা কাগজটা আম্মার হাতে। আম্মা আর রুজি দুইজনেই আমার রোল খুঁজতেছে।

আম্মা, রেজাল্ট ছাপা হইছে? আমি মৃদুস্বরে বলি।
হ্যাঁ, হইছে। রুজি বলে।
আমার রোলটা খোঁজো।
তাই তো খুঁজতেছি। আম্মা বলেন।
পাওয়া যাইতেছে না আম্মা?
এখনো খুঁজতেছি।
না পাওয়া গেলে তুমি কি অনেক মন খারাপ করবা, আম্মা?
না সিটি কলেজ খারাপ কী! তুই তো চেষ্টা করছিস। আম্মার কণ্ঠে সান্ত্বনা দেবার মতো ভঙ্গি।
আমার মনটা দমে যায়। মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় আমি পাইছি ৭৪৫। স্টার পাই নাই, কিন্তু মানবিক বিভাগ থেকে ৭৪৫ তো কম নম্বরও নয়। লোকে তাই বলতেছে। আর আব্বা খুব আশা করে আছেন, ছেলে তাঁর ভালো কলেজে পড়বে। তিনি বলছেন, 'টাকার জন্যে চিন্তা নাই, আমার ছেলে ছাত্র ভালো, ওকে আমি অবশ্যই ভালো কলেজে পড়াব।' এখন যদি চান্স না পাই! আমার খুব কান্না পাইতেছে। সিটি কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে না আসলে। আমি আর স্বপন, আমার আরেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সহপাঠী বন্ধু, আমরা দুজনে মিলে গেছলাম সিটি কলেজে। অন্ধদের জন্যে পরীক্ষা দেওয়া সহজ নয়। কতগুলা ঝামেলা আছে। যেমন পরীক্ষার সময় একজন করে 'রাইটার' আমাদের জোগাড় করতে হয়। সেই রাইটার হইতে হবে অবশ্যই ছোট ক্লাসের। এসএসসি পরীক্ষার জন্যে রাইটার ক্লাস এইটের চেয়ে বড় ক্লাসের হইতে পারবে না। সেই রাইটারের ছবি-পরিচয় আগে থেকেই জমা দিয়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়া রাখতে হয়। সেই অনুমতির জন্যেই আমরা গেছলাম সিটি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে। তিনি আমাদের দেখেই ঝাঁঝাল কণ্ঠে বললেন, তোমরা এখানে এসেছ কেন?
স্যার, কলেজে ভর্তির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।
যাও যাও। নটর ডেমে যাও। এখানে ব্লাইন্ডদের কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা তোমাদের ভর্তি নেব না!
অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সেদিন আমাদের চলে আসতে হইছিল। আম্মাকে সেই ঘটনা জানাই নাই। আম্মা শুনলে মন খারাপ করবেন।
এখন আম্মা আমাদের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দেখতেছেন। রুজিও দেখতেছে। আমার ভাগ্নি জেসমিনও এসে দাঁড়ায় তাদের পাশে। আমি টের পাই। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মেজপাও আসেন। অনেকক্ষণ হলো ওরা নাম খুঁজতেছেন উত্তীর্ণদের তালিকায়। মনে হয় খুঁজে পাইতেছেন না। না পাইলে সেটা হবে খুবই কষ্টের ব্যাপার। আমাকে ফিরে যাইতে হবে সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। আমার গলা ধরে আসতেছে। আমার চোখ বাঁধ মানতে চাইতেছে না। আমার চোখের নিচে জল।
অন্ধদের চোখ অন্তত একটা কাজে লাগে।
চোখ দিয়া আমরা কাঁদি।
একখণ্ড মেঘ এসে সূর্যটাকে আড়াল করল, মনে হইতেছে। রোদ মরে গিয়া ছায়া পড়ে। বাইরে। বারান্দার বাইরে খোলা আকাশের নিচে।
এই তো!–রুজির কণ্ঠে খুশি।
বাবা আজাদ! আম্মার গলা!
চমকে উঠি! বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়ে।
আল্লাহর কাছে শোকর কর। আল্লার রহমতে তুই চান্স পাইছিস। আম্মা বলেন।
আমার কষ্টের কান্নাটা আনন্দের অশ্রুতে পরিণত হয়। আমি কাঁদতে কাঁদতে আম্মাকে জড়ায়া ধরি। আমি নটর ডেমেই ভর্তি হইতে চাইছিলাম। আর কোথাও নয়।
আমার দুই চোখের আলো একেবারে নিভে যাওয়ার দশ বছর পর, অন্ধত্বের দশটি বছর ক্রমাগত সংগ্রাম করে আজ আমি নটর ডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পাইতেছি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, নিজের যোগ্যতায়। কারও করুণায় নয়।
আম্মা আমাকে জড়ায়া ধরে আছেন। তার চোখের গরম জলও পড়তেছে আমার মাথায়। আমার কী যে খুশি

লাগতেছে!
রুজি চিৎকার করে, বড়পা, বড়পা। ভাইজান নটর ডেম কলেজে চান্স পাইছে।
আমার পাশে আমার বড়পা, মেজপা, রুজি, ভাগ্নি জেসমিন, আর আম্মা। তাদের সবার মুখে নিশ্চয়ই আনন্দ। আমি সেই আনন্দ দেখতে পারতেছি না বটে, কিন্তু খুশিরও একটা গন্ধ থাকে। আমি সেটা অনুভব করতে পারতেছি ঠিকই।
রুজি বলে, আব্বাকে খবরটা দেই। তাইলে আব্বা মিষ্টি কিনা আনবে। সে আব্বার দোকানের দিকে দৌড় ধরে।
পেছনে পেছনে বড়পার ছেলে ছোট্ট বাবু 'খালামণি, আমিও যাব' বলে দৌড় ধরল, আমি টের পাই।
মেঘটা সরে গেছে। আবার রোদ এসে নাচতেছে আমাদের আদমজীর বাসার বারান্দায়, উঠানে, প্রাঙ্গণে।

২.

আমি জন্মান্ধ নই। আমরা পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনজনই ভিজুয়ালি ইমপেয়ার্ড, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, সোজা বাংলায় অন্ধ, কিন্তু আমাদের কেউই আমরা অন্ধত্ব নিয়ে জন্মাই নাই। আমাদের প্রত্যেকের টাইফয়েড হইছিল, একেকজনের একেক সময়, টাইফয়েড কেড়ে নিয়ে গেছে আমাদের দৃষ্টিশক্তি।
ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমার চোখ ভালো ছিল। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমি আর সবার মতো স্কুলে গেছি।
আমার জন্ম কিন্তু কুমিল্লার লাকসামের একটা গ্রামে। ওখানে কেটেছে আমার জন্মের পর কয়েকটা বছর। ডাকাতিয়া নদীর ধারে। মনোহরগঞ্জ বাজার থেকেও মাইলখানেক যেতে হয়। পথে কতগুলো ব্রিজ যে পড়ে!
আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছেই দুটো বড় বড় সেতু। তার নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খাল। সেই খালের কথা আমার খুব মনে পড়ে, শীতকালে পানি কমে গেলে একবার গোসল করতে নেমে আমরা গামছা দিয়ে মাছ ধরছিলাম, ছোট ছোট চাঁদা মাছ আর বেলে মাছ, মনে পড়ে। বেলে মাছগুলো খুব বোকা হয়। ওদের প্রায় হাত দিয়েই ধরা যেত। আর একবার বাবা নদীঘাট থেকে মাছ কিনে আনলে আমরা পাইছিলাম কতগুলা রঙিন খলসা আর একটা বউ মাছ। সেসবকে বয়ামে রেখে দিছিলাম পানি দিয়া, সেই ঘটনাটা এখনো মনে পড়ে। বউ মাছটা ছিল আশ্চর্য রঙিন। খলসাগুলাও। বয়ামটা উঠানে এনে রোদে রাখলে মাছগুলোর গায়ে রোদ পড়ে ঝিকমিক করতেছিল। সেই বউ মাছটার লাল নীল সোনালি সবুজ ঝকমকে মনোহর কান্তি আমি চিরদিনের জন্যে আমার স্মৃতিভাণ্ডারে জমা করে রাখছি। যেমন ছোটবেলায় রঙধনু উঠলে বড়পা ডেকে বলতেন, আজাদ, আয়, ওই দেখ রঙধনু উঠছে, কী মুগ্ধ বিস্ময়েই না তাকায়া থাকতাম! আর খুব মায়া হইত মেজপার জন্যে। ওই তখন একমাত্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, আমাদের মধ্যে। আমরা রঙধনু দেখতেছি, বউমাছ দেখতেছি, মেজপা তো দেখতে পাইতেছেন না। আর মেজপাটা যে কী সুন্দরী একটা মেয়ে, ও তো কোনো দিনও বুঝবে না। সেই নদীতীর, নদীতে বড় বড় বাঁশ পুঁতে জাল পেতে রাখা মাঝিরা, নদী বেয়ে চলা বিচিত্র নৌকা, কখনো পালতোলা, কখনো দাঁড় বেয়ে চলা, সেইসব দৃশ্য এখনো চোখে ভাসে। সবচেয়ে খুশি লাগত পালতোলা নৌকা দেখলে। গয়না-নৌকা ভরে যাইত মাটির নানা বাসন, হাঁড়ি-কলস, তাদের কমলা-গা চোখ জুড়ে থাকত। মাছরাঙা পাখি উড়ত নদীর আকাশে, প্রচণ্ড রোদেলা দিনে সেইসব রঙদার একেকটা পাখি কী দ্রুত খাড়া নেমে যাইত পানিতে, আর ছোঁ মেরে একটা মাছ ঠোঁটে বিঁধায়া উড়ে যাইত আকাশে! আমাদের ঘরটা ছিল কাঠের, ওপরে টিন। কাঠের খুঁটিতে আলকাতরা লাগানো ছিল। মা মাঝেমধ্যে আচার কিংবা ডালের বড়ি শুকাইতে দিলে আমাকে তুলে দিতেন টিনের চালে। রোদে টিন গরম তাওয়া হয়ে থাকত, স্যান্ডেল না পরে ওঠাই যেত না। সকালবেলা আমার কাজ ছিল হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়ের দরজাটা খুলে দেওয়া, সন্ধ্যা হলে বন্ধ করে দেওয়া। হাঁসগুলা পথ ভুলে যাইত, নাকি ওরা বুঝত না যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দেখা গেল ওরা আসেনি। আমরা ভাইবোনরা ছুটতাম হাঁস খুঁজতে।
একদিন মেজপা-ই এসে খবর দিলেন, শিমুলতলায় ডোবার পানিতে হাঁসগুলো আছে, ওর চোখ নাই, তবুও ও ঠিকই বুঝছিল, আমরা গিয়া দেখি, সত্যি। সেই থেকে আমি জানি, চোখ না থাকলেও দেখা যায়। কেবল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাই সেটা পারে।
সেই নদীতীরবর্তী গ্রাম ছেড়ে আমরা এলাম ডেমরায়। ভাড়াবাসা। পাকা বিল্ডিং, দুইটা রুম। তখনো সবটা ঘনবসতিপূর্ণ হয় নাই। নিচু জমি ছিল। ধানক্ষেতও ছিল। আমার স্বাধীনতা কমে আসে। নদী নাই। বন্ধুরা নাই। হাঁস-মুরগিগুলাও নাই। তার ওপরে যুক্ত হলো নতুন যন্ত্রণা। স্কুল।
কিন্তু স্কুলও ভালো লাগতে শুরু করে একসময়। নতুন বন্ধু হয়। তারপর পরীক্ষায় ফার্স্ট হইতে শুরু করলাম। আম্মা খুব উৎসাহ দিতেন পড়াশোনায়। আর বড়পা আমাকে সাহায্য করতেন পড়াশোনার ব্যাপারে। আব্বা ব্যস্ত থাকতেন ব্যবসা নিয়া। আব্বার ছিল যৌথ ব্যবসা। তিনি তখন শেয়ারে মাংসের দোকান চালাইতে শুরু করছেন। মা আরবিতে

দক্ষ ছিলেন। তবে এদের কেউই উচ্চশিক্ষিত নন।
বড়পার বিয়ে হয়ে গেছল আমি খুব ছোট থাকতেই। কিন্তু বড় আপু সব সময় আমাদের সাথেই থাকেন। উনিই আমাকে পড়াতেন।

৩.
তখনো আমি দৃষ্টিশক্তি হারাই নাই। তখনো আমি এই জগতের সমস্ত আলো আর রঙ আর অবয়ব মনপ্রাণচোখ ভরে দেখি। ডেমরা আস্তে আস্তে বড় হইতেছে, ঘনবসতিপূর্ণ হইতেছে, ধানক্ষেত উঠে যাইতেছে, আর সেখানে উঠতেছে ঘরবাড়ি দোকান। আমি স্কুলে যাই। ফার্স্ট হই। বাড়ির সবাই আমাকে খুব আদর করে। বড়পা, দৃষ্টিহীন মেজপা আর আমার ছোট বোন দুইটা। ওদের সঙ্গে সারাক্ষণ এক্কা দোক্কা খেলি, কিত্ কিত্ খেলি, কড়ি খেলি।
মেজপা চোখে দেখেন না, কিন্তু কাজকর্ম সবই পারেন। তার গোসল, খাওয়া, এইসব তো তিনি নিজে নিজে আর একা একা করেনই, এমনকি রান্নাবাড়া, কাপড়-কাচা এইসবে আম্মাকে সাহায্যও করেন। বড়পা হয়তো আমাকে পড়াইতেছেন, মেজপা ছোট বোন দুইটা–রত্না আর রুজিকে গোসল করায়া কাপড়চোপড় পড়ায়া চুল বেঁধে দিয়া খাওয়ায়া-দাওয়ায়া ঘুম পাড়ায়া ফেলছেন। এই রকম করিতকর্মা তিনি। আগে থেকেই।
ক্লাস ফাইভে পড়ি। বৃত্তি পরীক্ষা দেব। স্কুলে স্যাররা একটা তালিকা করেছেন কে কে বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। তাতে আমার নাম আছে। প্রস্তুতিও নিতেছি।
বড় আপা আমাকে কিনে এনে দিছেন ছাত্রসখা বৃত্তি বই।
এর মধ্যে আমাদের ডেমরার পাট উঠল। আব্বা, তখন ছিলেন চিকন-চাকন, থুতনিতে দাড়ি, নারায়ণগঞ্জ আদমজী জুট মিল চত্বরের ভেতরে মাংসের দোকান দিছেন। ওই ব্যবসাটা শেয়ারের নয়। আব্বা একাই মালিক। আব্বার এক আত্মীয় আছেন, মিল এলাকায় প্রভাবশালী। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিছেন। ব্যবসা ভালো চলতেছে। এত দিন আব্বা ডেমরা থেকেই যাতায়াত করতেন, এখন আদমজীর ভেতরে ভালো বাসা পাওয়া গেছে। আমাদের সবাইকে ওখানে যেতে হবে।
আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এই স্কুলটা ভালো লাগতে শুরু করছিল। বৃত্তি দেওয়ার জন্যে ভালোমতো রেডি হইতেছিলাম। আর এর মধ্যে স্কুল বদলানো। বাড়ি বদলানো।
কিন্তু আমি তো ছোট। আমি বাড়ি বদলাতে চাই কি না, সেটা আমাকে কে জিজ্ঞাসা করবে?
একদিন পাততাড়ি গুটায়া আমরা চলে আসলাম আদমজীতে।
ডেমরা থেকে আদমজী বেশি দূরে নয়। আসতে বেশিক্ষণ লাগল না।
কিন্তু মিল এলাকাটা আমার কাছে এক রূপকথার জগৎ যেন খুলে দিল।
আহ্। কী বড় দেয়ালঘেরা এলাকাটা। কী ভীষণ বড় গেট। গেটে পাহারাদার। দেয়ালে সাইনবোর্ড: সংরক্ষিত এলাকা। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। আপনার পরিচয় দিন।
কত বড় বড় পুকুর মিল এলাকার ভেতরে। বাইরে শীতলক্ষ্যা নদী। পাশে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউজের বড় বড় লোহার স্তম্ভ, তাতে কত যন্ত্রপাতি। আর আদমজী মিল এলাকার ভেতরে? সে এক এলাহি কাণ্ড। সারি সারি কলোনি। বাবুদের। অফিসারদের। শ্রমিকদের ডেরা। এরই মধ্যে শ্রমিক সংগঠনের অফিস, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়, বাজার, দোকান, বাসা। ওই যে ওখানে ডাকঘর। মসজিদ আর মসজিদ। ওই যে ওইখানে ছেলেদের স্কুল আর আরেক পাশে মেয়েদের স্কুল। এ এক আলাদা শহর। রেললাইন। রেলের লাল লাল ওয়াগন।
আরেকটা গেট পেরুলে মিল এলাকা। সারি সারি ছাউনি ঢাকা মিল। টাকার মধ্যে শিল্প-কারখানা বোঝাতে যেই ধরনের কোনা কোনা ছাদওয়ালা ঘর দেখানো হয়, তেমনি দেখতে সেগুলা। কী তার আওয়াজ! মিলের কাছে গেলে কানে তালা লেগে যেত। সশব্দে মিল চলতেছে তো চলতেছেই।
আর ছিল ম্যানহোল। একটা ব্লকের মধ্যেই ছয়টা সাতটা ম্যানহোল।
আর আমার সবচেয়ে মজা লাগত মিলের সাইরেন। সকালবেলা কাজে যোগদানের ডাকের জন্যে একটা সাইরেন। আধ ঘণ্টা পরপর আবার আরেক রকম আওয়াজ। ছুটির সময় তিনটা সাইরেন পড়ত। প্রথম প্রথম শুধু সাইরেন কখন বাজবে, কখন কী রকম বাজবে, সেই উত্তেজনাতেই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম।
আস্তে আস্তে সবই সয়ে যেতে থাকে।
নতুন স্কুলও খারাপ লাগে না।
আগের স্কুলের চাইতে বরং এই স্কুলটা বড়। আগের স্কুলটা ছিল টিনের। টিনের বেড়া, টিনের চাল। আর এই স্কুলটা

ইটের।

আব্বার মাংসের দোকানটা দেখতে যাই একদিন। বড়পার আঙ্গুল ধরে।

আদমজীতে আমার শেকড় ছড়াতে থাকে।

আমাদের বাসা ছিল ক লাইনে। ওটা ছিল ভাড়াবাসা। আর আব্বার দোকানটা ছিল ঢাকা বাজু মার্কেটে। আমি আব্বার দোকানে যাই। ফুটবল খেলি ছেলেদের সঙ্গে।

আর আমি ছিলাম বাসার দোকান-রানার। যখন যেইটা লাগবে, আজাদ, যা তো বাবা, একটা দিয়াশলাই লাগবে, এক দৌড়ে যা, চুলা ধরান যাইতেছে না, অমনি দে ছুট। ফিরে আসার পর আম্মার মনে পড়বে, আহা রে চিনিও তো শেষ, বিকালে চা হইব না, আজাদ আর এক বার যা বাবা, আধাসের চিনি কিনা আন।

আদমজীর শ্রমিকদের সঙ্গেও খাতির হতে থাকে।। একজন ছিলেন লাতু, একজন ছিলেন বরিশালের মজিদ। মজিদ চাচা আমাকে পান আনতে বলতেন। আমি আম্মার কাছে পান চেয়ে নিয়ে আসতাম। মজিদ চাচাকে দিতাম। মজিদ চাচা আমাকে টাকা দিতেন। একটা পানের দাম দিতেন এক টাকা। সেই টাকা পেয়ে আমি খুশিতে লাফ মারতাম। আমাকে ওরা ভালোবাসতেন ভীষণ। আমার ওই খুশি খুশি মুখটার দিকে চেয়ে থেকে মজিদ চাচার মুখটাও হাসিতে ঝলমল করে উঠত। তখন আমার নেশা হয়ে গেছল বেলি আইসক্রিমের মালাই খাওয়া। নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় ফ্যাক্টরিতে বানানো সেই আইসক্রিম আমার কাছে মনে হইত অমৃত। পরে আরেকটা নেশায় পাইছিল। নতুন ডাকটিকেট কেনা। টাকা পাইলে সোজা যাইতাম ডাকঘরটায়। সেইখানে টিকেট বিক্রি করতেন এক আংকেল, তার সারা গা, মাথার চুল এমনকি চোখের ভুরু পর্যন্ত ছিল সাদা। তার কাছ থেকে টিকেট কিনেই দৌড়ে বাসায় আসতাম। একটা বাউন্ড খাতায় টিকেটগুলো সেঁটে রাখতাম। নতুন ডাকটিকেটের উল্টা পিঠে জিভ দিয়ে থুতু লাগানোতেও ছিল আসল মজা। অদ্ভুত একটা গন্ধ আসে সেটা থেকে। পুরানা ডাকটিকেট জোগাড় করলে সেই মজাটা পাওয়া যায় না।

এরই মধ্যে জ্বর আসে। স্কুল যাওয়া বন্ধ। হাতে-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। জ্বর আর ভালো হতে চায় না। কবরাজি চিকিৎসা চলতেছে। জ্বর আসলে আম্মার বাতিক, আমাকে দুধ দিয়া পাউরুটি খেতে বলতেন। দুধ আমার অসহ্য একটা খাবার। আমি খাইতে পারি না। আমি কাহিল হয়া পড়ছি। প্রত্যেক দিন দোয়া পড়ি, আল্লাহ জ্বর কমায়া দাও। আল্লাহ জ্বর কমায়া দাও।

বেশ কিছুদিন ভোগানোর পর জ্বর নেমে যায়। কিন্তু রেখে যায় একটা সমস্যা। চোখ দিয়া খালি পানি ঝরে। চোখ লাল। জ্বালা বোধ হয়। আমি কান্নাকাটি করি। আম্মা আম্মা। আমি আর পারি না। আমার চোখ দুইটা তুলে নাও।

আমাকে নানা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। নানা রকম মেডিকাল সেন্টার। কোথাও কোনো উন্নতির লক্ষণ নাই। শেষে শীতলক্ষ্যার ওই পারের আবুল কবিরাজের চিকিৎসা শুরু হয়। আমার মনে আছে, মিলের সঙ্গেই শীতলক্ষ্যা নদী। নদীতে নৌকা। প্রথম প্রথম আব্বার সঙ্গে যেতাম নৌকা করে ওইপারে। পরে আব্বার দোকানের কর্মচারীরা নিয়ে যেত। নৌকা চলত। আমি নদীর পানির দিকে একনাগাড়ে তাকায়া থাকতাম। আমি নৌকার কিনারে বসে হাত বাড়ায়া দিয়া সেই পানি নাড়তাম। স্রোত বয়ে যাচ্ছে, দেখতাম। পানি পরিষ্কার থাকলে নিচে দেখা যাইত ছোট ছোট মাছের ঝাঁক। আর নিচে দেখা যাইত সবুজ শ্যাওলা, গুল্ম, শালুক। নদীর ধারে ঢোলকলমি, হেলেঞ্চা, বিষকাটালির ঝোপ। নৌকা নড়তে শুরু করলে আমি পানির ভেতরে তাকায়া দেখতে পাইতাম ওগুলা সরে সরে যাইতেছে।

আব্বা বলতেন, ঝুঁইকা বইসো না। পইড়া যাইবা।

আমি বলতাম, পড়ব না। ধরে আছি।

কবিরাজ ওষুধ দিতেছে। চোখের জ্বালা আর পানি পড়া তো কমে না। মনে হয়, দিন দিন আরও বাড়তেছে।

একদিন কবিরাজ বলে, আইজকা কড়া ডোজের ওষুধ দিমু।

হেলেঞ্চা পাতার কষ সে লাগায়া দেয় আমার দুই চোখে। এর চেয়ে চোখে মরিচ ডলে দিলে যেন কম জ্বালা করত। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি। আমার দশ বছরের ছোট্ট শরীরটাকে যাঁতা দিয়া ধরে রেখে কবিরাজ বলে, আরে কড়া ডোজ দিছি না! চোখ এইবার বাপ বাপ কইরা ভালো হইব।

বাসায় ফিরে এসেও চোখের জ্বালা আর কমে না।

পরের দিন আবার যাই কবিরাজের ডেরায়।

সে বলে, এই তো। এই রকম আর কয়েকবার দিলেই একদম চোখ হয়া যাইব আগের মতো। সব দেখা যাইব।

আশায় আশায় রোজ পার হয়ে যাই শীতলক্ষ্যা নদী। কিন্তু আগের মতো নদীর স্রোত দেখতে পাই না। নৌকা চলতে শুরু করলে শ্যাওলা, কচুরিপানা, ঢোলকলমিগুলা সরে সরে যায় না। আগে তো এইসব সরে সরে যাইত। আগে তো

সরে যাওয়া দেখতে পাইতাম। চোখ ধীরে ধীরে আরও নষ্ট হতে থাকে। আস্তে আস্তে চোখের আলো নিভে আসতেছে। ভালো করে আর দেখতে পাই না। তবে চোখে আলো ধরলে বুঝি। শুধু সেই অনভূতিটা এখনো সক্রিয় আছে। এর আগে মেজপা দৃষ্টিশক্তি হারাইছেন। রত্নাও অন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিবার সেইটা দেখছে। এখন আমিও অন্ধ হইতে যাইতেছি।

আমরা পাঁচ ভাইবোন। দুই বোন বড়, আর দুই বোন আমার ছোট। আমিই একমাত্র ছেলে। লেখাপড়াতেও ভালো। আমিও অন্ধ হয়ে যাব। বাবা-মা সেটা মেনে নিতে চান না। আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকায়, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে।

বড় দালান, সাদা পোশাক পরা নার্স। আমি আমার ঝাপসা চোখে সেইসব দেখি।

ওরা আমার চোখ পরীক্ষা করেন। নানা যন্ত্রপাতির মধ্যে আমার থুতনি বসায়া আলোর দিকে তাকায়া থাকতে বলেন আমাকে। সেইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলা হয়, চোখের তো বারোটা বাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। ঠিক আছে, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। একটা অপারেশন করতে হবে।

আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটা দেখতে কেমন, তা আমি বলতে পারব না। তবে আমাকে শুইয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল, সেটা আমার মনে আছে। আর মনে আছে, এরপর আমি আর চোখ দিয়ে আলো-অন্ধকারের পার্থক্য বুঝি না। অপারেশনের পর পুরোপুরিই দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ি আমি।

যেদিন ব্যান্ডেজ খোলা হয়, সেদিন আম্মা-আব্বার খুব প্রত্যাশাভঙ্গ হইছিল। আম্মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছেন, বাবা কিছু দেখা যায়? কিছুই দেখা যায় না? কিছুই না?

আমি বলি, কিছু না।

কিছুই দেখা যায় না?

আমি বলি, কালো। অন্ধকার।

আমার চোখে আলো ধরে বলে, এইবার বলো তো।

না। আমি কোনো কিছু টের পাই না।

আম্মা কাঁদতে থাকেন। আল্লাহর এইটা কী বিচার? আমি কী পাপ করছিলাম?

ডাক্তাররা বলেন, এই অন্ধত্ব জেনেটিক। সমস্যাটা নাকি হইছে, আমার আব্বা আর আম্মা মামাত-ফুপাত ভাইবোন। আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে করলে নাকি সন্তানদের সমস্যা হইতে পারে। অনেক সময়। কত জনেরই এইরকম বিয়ে হইতেছে। তাদের সন্তানেরা সুখে-স্বাস্থ্যে দিন কাটাইতেছে। শুধু আমরাই হলাম জেনেটিক সমস্যার শিকার। আমাদের পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনজনই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী।

আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে একা একা বেরুনো বন্ধ। আমার খেলাধুলা কমে আসে। আমার জীবনে এখন একটাই রঙ। কালো। আমি কান্দতে শুরু করি। ভয়াবহ কান্না। তিন দিন আমি একনাগাড়ে আমি শুধু কেঁদেই চলি। কান্দতে কান্দতে খাই। কান্দতে কান্দতে ঘুমাই। আবার জেগে কাঁদি।।

অন্ধের চোখ দেখার কাজে লাগে না। কিন্তু কাঁদার কাজে লাগে।

তারপর একসময় কান্নাও ফুরায়া আসে।

কিন্তু আমি যেহেতু অনেকদিন চোখে দেখছি, রঙের জগৎটা থেকে যায় কেবল আমার কল্পনায়। ধূসর শৈশবস্মৃতিতে।

৪.

নারায়ণগঞ্জে আদমজী জুটমিলের ভেতরের বাসায় দৃষ্টিহীন আমি আমাদের বাসার জানালার শিক ধরে দাঁড়ায়াই থাকতাম। কিন্তু কোনো কিছুই আমার চোখে পড়ত না। শুধু কানে আসত বাইরের কোলাহল। দূরে কারখানার চাকা ঘুরতেছে, তারই একটা একটানা আওয়াজ। আধঘণ্টা পর পর দূরাগত সাইরেনের ধ্বনি।

সময় বয়ে যাইতেছে। আমি দাঁড়ায়াই আছি।

এরই মধ্যে একটা পাখির শিস শুনতে পেলে আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। কী রঙের পাখি এটা? কী পাখি?

ও আবুল হাশেম আজাদ। তুমি কী কর?

পাখির গান শুনি, হুজুর চাচা–আমি বলতাম। আমাদের বাড়িওয়ালাকে আমরা এই নামেই ডাকতাম। আর তিনিও আমাকে ডাকতেন পুরা নাম ধরে।

কী পাখির গান শোন?

সেটা তো আমি বলতে পারি না, হুজুর চাচা।

দাঁড়াও দেইখা কই। ওইটা তো মনে হয় বুলবুলি। পাছা লাল। বুলবুলিই হইব।
পাখিটা কোথায় বসে আছে?
পাখিটা...সজনা গাছে।
কতক্ষণ আর একা একা বসে থাকা যায়।
আস্তে আস্তে বাইরের জগৎটা, বাড়ির চারপাশ আমার আত্মস্থ হতে থাকে।
আমি বাইরে আসতে শুরু করি।
বাড়ির সামনে ইটের স্তূপ। ইট ভেঙে গুঁড়ো করে নানা খেলা খেলি।
আর আমার খেলার সাথী ছিল আমার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী দুই বোন। মেজ আপা আর রত্না। আমার বয়স যখন ১১, মেজপার ১৩, রত্নার ৬। আমরা তিনজনই চোখে দেখতে পাই না। আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি মেজ আপা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। আর রত্না দুই বছর পর্যন্ত দেখতে পাইছে। আমার অন্ধত্বের আগে আগে ওরও টাইফয়েড হয়, টাইফয়েড না অন্য কিছু কে জানে, আমরা শুনে আসতেছি যে টাইফয়েড হইছিল এবং ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে চিরদিনের জন্যে।
আমরা তিনজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশু, একসাথে খেলতে যাই। আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাবার পরে সবচেয়ে বেশি কান্দছিলেন কিন্তু মেজ আপাই।
আমার মেজ আপা সাংঘাতিক সুন্দরী। আমি শেষ যখন তাকে দেখি, আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার আগে আগে, আমার তখন ১০, মেজ আপার বছর ১২, তখন কী ফুটফুটেই-না ছিলেন মেজপা।
আমি চোখে দেখতে পাই না, সেটা আমার জানা ও অভ্যাস হয়ে গেলেও মেজপার সেইটা মনে থাকত না। একদিন মাথার ওপর দিয়া শব্দ করে হেলিকপ্টার যাইতেছিল (বোধ হয়), মেজপা জিজ্ঞেস করেন, এই কিসের শব্দ রে?
আমি বলি, মনে হয় হেলিকপ্টার।
হেলিকপ্টার না উড়োজাহাজ?
হেলিকপ্টারই হবে। ভটভট শব্দ তো শোনা যায়।
শব্দ তো আমিও শুনি। দেইখা ক।
দেখুম কেমনে। তুমিও ব্লাইন্ড। আমিও ব্লাইন্ড।
আপা হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরেন। হু হু করে কাঁদতে থাকেন। তার চোখের গরম পানি আমার গায়ে পড়তেছে। তিনি বলতেছেন, আজাদ রে। তুই না দেখতে পাইতি...তোর কী হইল?
আমি দাঁড়ায়া আছি জানালা ধরে। হুজুর চাচা নামতেছেন দোতালা থেকে। তার পায়ের আওয়াজ শুনেই আমি বুঝতে পারতেছি।
আমি বলি, হুজুর চাচা, কেমন আছেন?
ভালো আছি আবুল হাশেম আজাদ।
চাচা, খেলার খবর কী? ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ওয়ান ডে না আজকে?
না। খেলা দেখাইতেছে না তো। বাজারে গেলে জানতে পারব। ওইখানে ডিশ এন্টিনা আছে।
হুজুর চাচা চলে যান। ফেরার পথে তিনি আমার জন্যে আনেন খেলার খবর আর চকলেট।
হুজুর চাচাই আব্বাকে ধরেন। আম্মাকে বোঝান। আপনাদের ছেলেটা, আল্লায় দিলে খুবই ব্রেনি। ছেলেটাকে ঘরে বসায়া রাখতেছেন কেন? কত অন্ধ লেখাপড়া কইরা বড় বড় চাকরি-বাকরি করতাছে। আবুল কালাম আজাদরে স্কুলে ভর্তি করায়া দেন।
কোন স্কুলে ভর্তি করামু? কে নিব? আব্বা বলেন।
হুজুর চাচা বলেন, আমার খোঁজে একটা স্কুল আছে। খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল।
আমি খ্রিষ্টান স্কুলে বাচ্চা পড়ামু না। আব্বা সরোষে বলেন।
হুজুর চাচা ছিলেন হুজুর। নামাজি। তার দাড়ি আছে, বড়, তিনি আলখেল্লার মতো পাঞ্জাবি পরতেন, মাথায় সব সময় থাকত টুপি।
তিনি বলেন, এই ছেলে এইভাবে বইসা থাকব? আপনার আরও দুই মেয়ের চোখ নষ্ট। আপনের যদি আল্লা না করুক, অহনই কিছু হইয়া যায়, তখন কী হইব। এরা কি ভিক্ষা করব? ইমান হইল নিজের কাছে। স্কুলে স্কুলের পড়া পড়ব। আর আরবি তো ও মায়ের কাছেই পড়া শিখছে। নামাজ-কালাম পড়তে পারে। ইমান ঠিক থাকলে মুসলমানের ছেলের খ্রিষ্টান স্কুলে গেলে অসুবিধা কী! শুনেন, হাদিসে আছে, জ্ঞান অর্জনের জন্যে চীন দেশের মতো দূর দেশে

হইলেও যাও। নবীজি (দ.) যখন এইটা বললেন, তখন চীনে কি মুসলমান আছিল? চীনে কি আরবি পড়াইত? জ্ঞানের কুনো মুসলমান-খ্রিষ্টান নাই। জ্ঞান হইল জ্ঞান। আর সেইটা তালেম করা প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের জন্যে ফরজ।
না। আমি আমার ছেলেরে খ্রিষ্টান স্কুলে দিমু না। আপনে যান।
আমি সব শুনতে পাই। আমার খুব কান্না পায়। হুজুর চাচা কি মন খারাপ করে চলে যাইতেছেন? আম্মা কি কান্দতেছেন?

৫.
আব্বা বাসায় নাই।
আম্মা আমাকে বলে রাখছেন, হুজুর চাচা যখন যাইব, তখন তারে খাড়া করায়া আমারে ডাকবি।
আমি জানালার শিক ধরে দাঁড়ায়া থাকি।
কখন হুজুর চাচার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাবে। কখন তিনি আসবেন।
কে কে যাইতেছে, কে কে আসতেছে–আমি সব টের পাইতেছি। শুধু শব্দ শুনে।
ওই হুজুর চাচা আসতেছেন।
হুজুর চাচা?
কী বাবা আবুল হাশেম আজাদ।
আপনি একটু দাঁড়ান। আম্মা আপনার সাথে কথা বলবে। আম্মা আম্মা...
আমি আম্মাকে ডাকি।
আম্মা আসেন। ভাইসাহেব, আমি পোলারে খ্রিষ্টান স্কুলেই ভর্তি করামু। আপনি সব ব্যবস্থা কইরা দেন।
আচ্ছা ভাবিসাব, আমি পাত্তা লাগাইতেছি।

৬.
১৯৮৯ সালের মে মাসে আম্মা আর হুজুর চাচা আমাকে রেখে যান মিরপুরের মনিপুরে, দি স্যালভেশন আর্মি স্কুলে। এবিসি পরিচালিত এই স্কুল। এবিসিতে অ্যাসিসন্টান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন।
বেবিট্যাক্সিতে চড়ে মিরপুর আসি আমরা। আমার কাপড়চোপড় জিনিসপাতি সব আমার ব্যাগে।
বোনগুলোর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার খুব কান্না পাইতেছিল। আমি তো ওদের দেখতেছি না। ওদের কাছ থেকে বিদায় নেই হাত ধরে ধরে। তারপর উঠে বসি বেবিট্যাক্সিতে। মাঝখানে আমি। এক পাশে আম্মা, আরেক পাশে হুজুর চাচা।
বারবার মনে পড়তেছিল আমার বোনদের কথা। ছোট্ট বোনটি, রুজি, গুটি গুটি পায়ে আমার কাছে আসে, এটা-ওটা কত কথা জিজ্ঞেস করে, ত দিয়ে বলে সব কথা, আসো বসোকে বলত, আতো বতো। ওর আধো আধো কথাগুলো এখন কানে ভাসছে। ও যখন খুব কাঁদে, আমি কোলে নিয়ে একটু হাঁটি, ব্যস, তাহলেই চুপ। আর আমার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী দুই বোন, মেজ আপা আর রত্না, আমার খেলার সাথী, আমি চলে আসার সময় ওরাও কান্দতেছিল। শব্দ করে কান্দে নাই, কাজেই আমি দেখতে পাই নাই, কিন্তু ওদের যখন বললাম, আসি, ওরা যখন বলল, ভালো করে লেখাপড়া কইরো, তখন ওদের কান্নার মধ্যেই–আমি উপলব্ধি করতে পারি–আছে অশ্রু। রত্না আর আমি কত রান্নাবাটি খেলছি, আমি কত দোকানওয়ালা হয়েছি। আর তা ছাড়া আমাদের আদমজী নারায়ণগঞ্জের বাসাটার অন্ধিসন্ধি আমার ছিল মুখস্থ। এখন আমি কোথায় যাইতেছি, এখানে কারা থাকে, জায়গাটাই-বা কেমন, কোথায় বাথরুম, কোথায় খাওয়ার ঘর, বুঝব কেমন করে।
আর আছে আমার বড়পা। বড়পার বিয়ে হয়েছে কুমিল্লায়, কিন্তু প্রথম সন্তান জন্ম দেবার জন্যে তিনি আমাদের বাসায় এসে ওঠেন। বাচ্চাটা মারা যায়। এরপরে উনি শ্বশুরবাড়িতে কমই থাকতেন। আমাদের বাসাতেই থাকতেন বেশিক্ষণ। তার একটা মেয়ে হইছে। দুলাভাই মেয়েটার নাম রাখছে জেসমিন। জেসমিন যখন খুব কানত, তখন আমি ওকে ঘাড়ে নিয়া হাঁটতাম। ও চুপ করে আমার ঘাড় খাইত। এদের সবাইকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকব?
আমার বুকের ভেতরে বাষ্প জমতেছে, গলার কাছটা ধরে আসতেছে, আমার চোখ টলমল করতেছে পানিতে, কালো সানগেলাসের নিচে সেই অশ্রু আমি লুকায়া রাখি। আমার রাগ হইতেছে, কিন্তু আমি চুপ করে থাকি।
বেবিট্যাক্সি একসময় থামে। আমরা নামি।

আম্মা আমার হাত ধরে ধরে নিয়ে চলেন।
আমরা একটা জায়গায় থামি। হুজুর চাচা বলেন, আমরা ছেলেকে ভর্তি করাইতে আইছি। আগে কথা হইয়া আছে।
আচ্ছা যান।
বুঝতে পারি এটা হলো গেট।
ভেতরে যাই। সিঁড়ি বেয়ে একটা ভবনে পা রাখি। এগিয়ে যাই। একখানে গিয়ে আমাকে একটা চেয়ারে বসতে বলা হয়। বসি।
তোমার নাম কী?
অচেনা নারীকণ্ঠ শুধায়।
আবুল হাশেম আজাদ। আমি বলি।
আগে কি কিছুদিন লেখাপড়া করেছ? স্কুলে যেতে?
আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলি।
আম্মা বলেন, ও তো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ছিল। ক্লাসে ফার্স্ট হইত।
আচ্ছা আচ্ছা, নারীকণ্ঠ অনুমোদনের ভঙ্গিতে বলে।
ভর্তির কাজ সম্পন্ন হয়।
আম্মা বলেন, ছেলেটারে দেইখা রাইখেন। আমার একটাই ছেলে।
অচেনা কণ্ঠস্বর বলে, আপনি দেখাশোনার জন্য চিন্তা করবেন না। এখানে প্রত্যেকটা ছেলের খুব যত্ন করা হয়।
খাওয়া ক্যামন দেয়? আম্মার কণ্ঠে উদ্বেগ।
খুব ভালো। প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেক বেলায় ১২৫ গ্রাম মাছ নাইলে মাংস। আমাদের যিনি কাপ্টেন তিনি মহিলা, বিদেশি, বিয়ে করেন নাই, শাড়ি পরে থাকেন, বাঙালি হয়ে গেছেন মানুষের সেবা করতে এসে, প্রতি সপ্তাহে এসে খোঁজ নেন, এত কম পরিমাণ দুধ কেন এই মাসে কেনা হয়েছে, তোমরা কি প্রত্যেক বাচ্চাকে এক গেলাস করে দুধ প্রতিদিন দাও না? আমাদের খুব টাইট অবস্থায় রাখা হয়েছে। এইখানে কোনো বাচ্চার অযত্ন হবার কোনো চান্স নাই। আসেন। ওদের হোস্টেলটা আপনাকে দেখাই।
আমরা উঠি। আমি তো কিছুই চিনি না। হাত ধরে ধরে আমি হাঁটতেছি।
দোতলায় উঠি।একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের। আমাকে একটা খাট দেখিয়ে বলা হয়, এইটা তোমার খাট। এই খাটে তুমি থাকবা।
আমি তো কিছু দেখতেছিও না। কোনো কিছু চিনতেছিও না।
আম্মা বলেন, দোতলা খাট। ও উঠবে কেমন কইরা?
অচেনা কণ্ঠ বলে, ঠিক পারবে। অন্য বাচ্চারা আছে না। কি বাবা আজাদ, পারবে না?
পারব। আমি বলি।
আম্মা বিদায় নেন। যাবার আগে ওই নারীকণ্ঠের হাতে–উনি আমাদের মেট্রন, পরে জানতে পারব–কুড়িটা টাকা দিয়ে বলেন, ও যদি কোনো কিছু খাইতে চায়, কিইনা দিয়েন।
এইবার আর আমার তেমন কান্না পায় না। মন খারাপের কুয়াশাটাই শুধু ঘিরে থাকে আমাকে।
রুমে তখন একটা রেডিও বাজতেছিল। রেডিওতে হইতেছিল বাণিজ্যিক কার্যক্রমের অনুষ্ঠান। একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে শুরু করে। চরম আঘাত সিনেমাটার নাম। আমি নিজের জীবনের আঘাতের কথা ভুলে সিনেমার নায়ক-নায়িকার জীবনের চরম আঘাতের বিবরণের দিকে কান দেই।
একটা ছেলে এসে আমার হাত ধরে। আসো।
কই যাব? আমি বলি।
ভাত খাইতে। ডাইনিংয়ে। ছেলেটা বলে। তোমার নাম কী?
আজাদ। আমি বলি। তোমার নাম?
আমার নাম গাদন। সে বলে। এইটা আবার কী রকম নাম? আমি ভাবি। পরে আমি জানতে পারছিলাম, ও আসলে চাকমা। ওর কথা শুনে সেটা বোঝার উপায় ছিল না। ও সুন্দর বাংলা বলতে পারত। শুধু দন্ত্য স আর তালব্য শ উল্টাপাল্টা করে ফেলত।
গাদন আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে যায় ডাইনিংয়ে। বুঝলাম আরও অনেকেই এখানে আছে। কারণ অনেক শব্দ হচ্ছিল। পরে আমি বুঝব, ওই হোস্টেলে আমরা ছিলাম ৩৫ জন। ডাইনিংয়ে সারি সারি বেঞ্চ। টেলিভিশন।

আমাকে ডাইনিংয়ের বেসিনে নিয়ে যায় গাদন। ভাববেন না গাদন চোখে দেখে। গাদনও আমার মতোই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এখানে যে ৩৫ জন ছাত্র, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে, তাদের সবাই হয় পুরোপুরি অন্ধ, নয়তো খুবই ক্ষীণদৃষ্টি। গাদন যেহেতু পুরানো ছাত্র, স্কুল কম্পাউন্ডের সবকিছু তার ধাতস্থ হয়ে গেছে। সে একা একাই চলাফেরা করতে পারে।

গাদন আমাকে বেঞ্চে বসায়া আমার হাতে একটা গেলাস ধরায়া দেয়। স্টিলের গেলাস। বলে, এটা তোমার গেলাস। তুমি সব সময় (ছব ছময়) এইটা ব্যবহার করবা।

আমি বুঝব কেমন করে?

এই গেলাসের নিচে বাইস (বাইশ) লেখা আছে। দেখো।

আমি হাত দিয়ে গেলাসের তলা পরখ করে দেখি। কিছু একটা লেখা আছে। ব্রেইলে লেখা ছিল আসলে। তখন তো ব্রেইল কী জানি না। এই গেলাসটাই আমাকে রোজ খুঁজেপেতে নিয়ে আসতে হবে, নিজে নিজে।

আমি বলি, আমি তো এত গেলাসের মধ্যে এইটা আলাদা করে খুঁজে বার করতে পারব না।

আমি তোমাকে হেল্প করব। গাদন বলে।

থালা নিয়া বসে আছি। একজন ভাত দিয়া যায়। নড়াচড়া শুনেই বুঝতে পারি মহিলা। পরে জেনেছি, উনি মণিকা মাসি।

এরপর একজন এসে দিয়ে যায় ভাজি। ভাজি খাওয়া হয়ে গেলে তরকারি। তারপর ডাল। মণিকা মাসি ছাড়াও আরেকজন মাসি ছিলেন ডাইনিংয়ে–লতা মাসি।

গাদন আমাকে আমার বিছানা, টেবিল, দরজা-জানালা সব চিনায়া দেয় । আমি সদ্য পাওয়া এই সব তথ্য আমার স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখার চেষ্টা করি।

শুরু হয় মিশনারি স্কুলের ছাত্রাবাসের কঠিন জীবন।

দোতালা খাটে শুতে হয়। একটা কাঠের মই বেয়ে উঠতে হয় সেই খাটে। সকাল ছয়টার মধ্যে ঘণ্টা বাজে। বিছানা ছাড়তে হয়। আধঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে চলে যেতে হয় প্রার্থনাঘরে। খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল তো! সেখানে গান গাইতাম, ঈশ্বরের গান–বলো বিজয়ের পতাকা, বলো জগতের আনন্দ সমাচার। বাইবেল পড়তাম–লোকসমাচার, লোক সুখবর। প্রার্থনা করতাম আমরা। যে যত ভালো প্রার্থনা করতে পারে, তাকে তত ধন্যবাদ দেওয়া হইত। আমি খুব ভালো প্রার্থনা করতে পারতাম। পাম্পপট্টি দিয়া প্রার্থনা করতাম তো, ওরা খুব খুশি হইত। যেমন: হে প্রভু, তুমি আমাদেরকে আহার দিয়েছ, তাই আমরা খেতে পাচ্ছি, নাহলে আমরা খেতে পারতাম না...হে প্রভু, তুমি দয়ার সাগর, তুমি আমাদের রক্ষা করো, আমাদের মঙ্গল করো, জগতের সবার ভালো করো...

আধঘণ্টা প্রার্থনা। সাতটার মধ্যে খেতে যাই সকালের নাশতা। সেটা তো এক ইতিহাস। খাওয়াটা। আমরা বাসায় সকালে খেতাম ভাত। রুটিটা আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না। কিন্তু এইখানে প্রাতঃরাশ হিসাবে দেওয়া হয় রুটি আর সুজি। সুজি জিনিসটা তো আমি দেখতে পারি না। আর দিত দুধ। ওইটাও আমার অসহ্য। এইসব আমি খাইতাম না।

এরপরে শারীরিক কসরত। পিটি। পিটি ম্যাডাম আমাদের পিটি শেখান। আমাদের লাইন করে দাঁড় করানো হয়। লেফট রাইট লেফট রাইট। তারপর ম্যাডাম বলেন, এইবার হবে এক নম্বর এক্সারসাইজ। এক, দুই, তিন, চার। ম্যাডাম এসে আমার হাত ধরে ধরে দেখিয়ে দেন একে কী, দুইয়ে কী! আমার সোনার বাংলা গান গেয়ে পিটি থেকে ফিরে এসে গোসল। এক ঘণ্টা পরে শুরু হবে স্কুল। এর ফাঁকে একটু সময় পেলে একটুখানি আশপাশে হয়তো ঘুরলাম। আমরা ঘুরতাম জোড়ায় জোড়ায়। গলাগলি করে। তারপর ক্লাস।

ক্লাস হইত দোতালায়। আমি ভর্তি হইছি নার্সারি ক্লাসে। হায় রে আমার নিয়তি! ক্লাস ফাইভের ফার্স্ট বয়, সম্ভাব্য বৃত্তি পরীক্ষার্থী দুই চোখ হারায়া এখন আবার নার্সারির ছাত্র।

আবার নতুন করে আমাকে অক্ষর চিনতে হবে। সংখ্যা চিনতে হবে।

টিচার আমাকে একটা স্কেলের মতো জিনিস দিয়ে যান। এইটাকে রাইটিং ফ্রেম বলে। এর মধ্যে ছোট ছোট ঘর। প্রত্যেকটা ঘরে ছয়টা করে ডট দেবার ব্যবস্থা। উনি আমাকে বলেন, দ্যাখো, প্রত্যেকটা ঘরে ছয়টা করে ডট আছে। এটা বোঝো। আর ডট দিতে থাকো।

আরে চোখে দেখি না, কিছু না। কোথায় কাগজ, কোথায় ডট দেবার বিশেষ কলম, কোথায় কী ডট দেব। ভীষণ মুশকিলে পড়লাম তো!

ছয়টা মাত্র ডট। দুটো ডট পাশাপাশি। এইভাবে ওপরে-নিচে তিন সারি। এই ছয়টা ডটের নানা ধরনের পারমুটেশন

কম্বিনেশন দিয়াই বাংলা ইংরাজি অঙ্ক ক্যাপিটাল লেটার স্মল লেটার সব লেখা যায়। পড়া যায়।
শুরু হয় আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায়। ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়তে ও লিখতে শেখা। প্রথম পাঠ হলো অক্ষর চেনা। ১, ২, ৩ আগে যেভাবে লিখতে-পড়তে পারতাম, সব ভুলে যেতে হবে। এখন থেকে আঙ্গুলের স্পর্শে ফোঁটা গুনে গুনে সেটা শিখতে হবে। আঙ্গুল দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে এটা কোন অক্ষর বা কোন সংখ্যা। এটা হলো পড়া।
আর রাইটিং ফ্রেম হাতে নিয়ে টিপে টিপে একটা একটা করে ডট সৃষ্টি করে লিখে চলতে হবে।
যখন আমার অক্ষর শেখার বয়স, তখন যদি এইভাবে অক্ষর চিনতাম, তাহলে হয়তো তাড়াতাড়িই শিখতাম। কিন্তু একবার একভাবে শিখে সেই শিক্ষা ভুলে এই বারো বছর বয়সে এইভাবে আরেকবার শেখা যায়!
আমি পারি না। আমার মন বিদ্রোহ করে। আমি পড়া ফাঁকি দেই। নানা দুষ্টুমি করি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রচণ্ড কড়া। একটু অমনোযোগী হলেই ভীষণ পিটুনি দেন। আমার পিঠে তারা বেত ভেঙে ফেলেছেন। পিঠ ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। সেই মারের দাগ আজও আছে।
নাজমুল হোসেন ফারুক স্যার নিজেও চোখে দেখেন না। তিনি কাছে আসেন। পিঠে মলম মেখে দেন। বলেন, আজাদ, পড়তে তো পারতেই হবে। না হলে কী করবি? তুই তো রিকশা চালাতে পারবি না। তুই তো চোখে দেখিস না। তুই কামার হতে পারবি না, কুমার হতে পারবি না, তুই দরজি হতে পারবি না, তুই ড্রাইভার হতে পারবি না। তোর সামনে একটাই রাস্তা। হয় লেখাপড়া করে মানুষ হ, নাহলে তোকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে খেতে হবে।
আমি সেইসব কথার মূল্য বুঝি না। আমি বলি, আমি বাড়ি যাব। আমাকে বাড়িতে পাঠায়া দ্যান। আমার লেখাপড়া শেখার দরকার নাই।
১০টায় একবার টিফিন। ডাইনিংয়ে এলে খাবার হিসেবে পাওয়া যায় চিড়া, মুড়ি, কলা, গুড় বা চিনি। ওরাই দিত এইসব। অথবা সিংগারা সমুচা। পেয়ারা। আম।
তবে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার ছিল দুপুরের খাবার। আমাদের মণিকা মাসি এত ভালো রাঁধতেন।
এরপর আছে হাতের কাজের ক্লাস। মোড়া বানানো শেখানো হয়। যিনি শেখান তিনিও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তিনি কীভাবে বেত বুনে বুনে মোড়া বানাতে হয়, সেটা শেখান। একটার পর একটা বেত বুনতে হয় নিয়ম মেনে। সবচেয়ে কঠিন গোল আকারটা আনা। আমি পারি না। প্রায়ই ভুল হয়। তিনি ডাকেন: আজাদ। আমি বলি, জি ওস্তাদ। দেখি কী করছ?
উনি হাত বাড়ায়া বুঝে ফেলেন। কোনটা বেত ওপরে যাবে আর কোনটা নিচে, সব তার জানা। সহজেই ভুল ধরে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা চলে যায় আমার কানে। মোড়া ওস্তাদের কান মলা খেতে খেতে আমার কানে ঘা হয়ে যায়।
দিন সাতেকের মধ্যেই আমার হোস্টেল ঘর, ডাইনিং, বাথরুম, স্কুলঘর, মাঠ–এই সব আমার চেনা হয়ে যেতে থাকে। আমি আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে যাই। মাঠের এক কোণে পানি সরবরাহের একটা পাইপ। সেই পাইপের ওপরে অনেকগুলো কল। কলের প্যাঁচ ঘোরাই। পানি বার হয়। কলের মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরি। পানি ছিটকে বার হতে থাকে। কী মজার খেলা! আমি পানি নিয়ে খেলি। আর রেডিও শুনে শেখা গান গাইতে থাকি। আমি বন্দী কারাগারে, আছি গো মা বিপদে...
বিপদের তখনো কিছুটা বাকি ছিল। হঠাৎই কান ধরে কে যেন টান দেয়। বদমায়েশির একটা সীমা থাকা দরকার না? মেট্রনের গলা। আমার কান ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। তারপর পিঠের ওপরে পড়তে থাকে বেতের বাড়ি। আমার পিঠ যেন ফেটে কেটে যায়।
আম্মা আসছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আম্মা আমার জন্যে আম নিয়ে আসছেন। আম্মা বলেন, আম কেটে দেই। খাবি। আমি চুপ করে থাকি। আম্মা আমাকে আম কেটে দেন। বলেন, খা।
আমি বলি, এখানে খাব না। বাড়ি গিয়া খাব।
আম্মা বলেন, খা। ছুটি হইলে বাড়ি লইয়া যামু।
আমি তার শাড়ি কামড়ে ধরি। আমাকে এখনই নিয়া যাও।
আমার কামড়ে শাড়ি ছিঁড়ে যায়। কিন্তু আমি শাড়ি ছাড়ি না। আমাকে না নিয়া আম্মা কিছুতেই আজ যেতে পারবেন না। কিন্তু আমি তাকে শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারি না। আম্মা চলে যান। স্কুলের গার্ড দানিয়েল আমাকে আটকায়া রাখে।
আরেক দিন ধরা পড়ি নারিকেল চুরি করতে গিয়া।

আমার রুমমেট সৃপন, শাহিন আর গাদন আর কুরবান। আর আমার একটা বন্ধু ছিল জুলহান। ওরা আমাকে মাঠে ঘোরাত। চেনাত এইটা নারিকেলগাছ, এইটা সুপারিগাছ। তো ওরা আমাকে বলে, আজাদ, গাছে উঠতে পার?
আমি বলি, পারি মানে? আমি বান্দরের মতো গাছে উঠতে পারি।
নারকেল গাছে উঠতে পারবা?
পারব।
আমি পায়ে একটা দড়ির মালার সাপোর্ট বানায়ে নিয়া তরতর করে গাছে উঠতে থাকি। হাতে একটা ব্লেড। গাছে উঠে বুঝি, নারকেল বেশ ধরে আছে। ব্লেড দিয়া নারকেলের বোঁটা কাটি। ওরাই আমাকে ব্লেডটা দিছল। হোস্টেল রুমে কারও কাছে ছুরিটুরি তো ছিল না। হোস্টেল চেক করা হতো, কোনো অস্ত্রপাতি রাখতে দিত না। তো ব্লেড দিয়ে বোঁটা কেটে তারপর ফেলতে থাকি নিচে। আপনারা ভাবতেছেন নিচের অন্ধ ছেলেগুলানের মাথায় পড়ল না নারিকেলগুলান! না। পড়ল না। কারণ কণ্ঠস্বর শুনেই তো বোঝা যায় কে কোথায় আছে। আমি অন্ধ হয়ে যাবার ছয় মাসের মধ্যেই শব্দ শুনে সবকিছু বুঝে ফেলার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলছি। কেউ কথা বলতেছে, কোন দিক থেকে বলতেছে, কেউ একটা গেলাস রেখে বলল, পানি খাও, গেলাসটা কোথায় রাখছে, এসব আমরা বুঝতে পারি। তো নিচে ছেলেরা কোথায় আছে বুঝে-শুনেই নারিকেল নিচে ফেলতে থাকি। সর্বানন্দ নামে একজন খ্রিষ্টান নৈশপ্রহরী ছিল তখন। সে চিৎকার করে ওঠে, এই কোরবান, তোমরা নারিকেল পাড় কেন। গাছটা ছিল ঠিক মেট্রনের জানালার কাছাকাছি। সেই কারণে কেউ না উঠে আমাকে উঠাইছে গাছের চূড়ায়। নাইটগার্ডের গলা শুনে এই তাড়াতাড়ি নামো তাড়াতাড়ি নামো বলতে বলতে আমাকে গাছের ডগায় রেখে সবাই পালিয়ে যায়।
আমি নামতে নামতেই সর্বানন্দ এসে হাজির। আমাকে ধরে নিয়ে যায় অফিস রুমে। মেট্রনের সামনে। মেট্রন ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করেন, সাথে কে কে ছিল। আমি কি আর সিনিয়রদের নাম বলব নাকি। বলি না। পিঠের ওপরে পড়তে থাকে বেতের বাড়ি। এমন মারটা মারল, কী বলব।
আমি দুষ্টও ছিলাম খুব। সুপারিগাছে উঠতাম। সুপারি তো কেউ খায় না। শুধু শুধু সুপারি পেড়ে পেড়ে ঢিল মারতাম এদিক-ওদিক। ওতেই আনন্দ।
আস্তে আস্তে স্কুলের সঙ্গে আমি খাপ খাওয়ায়া ফেলি। ব্রেইল পদ্ধতিতে অক্ষর চেনা আর লিখতে শেখাটা খানিকটা রপ্ত হয়ে গেলে পড়াশোনাও আমার সহজ লাগে। কারণ পড়তে আর লিখতে পারা ছাড়া অন্য সবকিছুই তো আমার আগে থেকে জানা। আমি পরীক্ষায় ভালো করতে থাকি।
স্কুলের নানা আচার-অনুষ্ঠানগুলোও মজা লাগে। বড়দিনে খুব বড় অনুষ্ঠান হয়। সেসবে যাই। বাইবেল পড়ে শোনানো হয়। শুনি। গানের অনুষ্ঠান হয়। গান করি। আর খেলি।
সবচেয়ে ভালো খেলতে শিখি দাবা। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ ধরনের দাবার ছক পাওয়া যায়। যেটায় ঘরগুলো উঁচুনিচু। আর দাবার গুটি তো আমরা হাত দিলেই বুঝি কোনটা কী। তবে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের দাবার গুটি একটু আলাদা। ঘোড়াটা অকেটা ঘোড়ার গলা-মুখের আদলে তৈরি। মিরপুরের জাকির মুন্সি নামের একজন এগুলো বানায় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যে।

৭.

গাদন ছিল লম্বায়-চওড়ায় বড়। কারণ ওর বয়স ছিল বেশি। কিন্তু লেখাপড়ায় ও মোটেও ভালো ছিল না। ও এক ক্লাসেই রয়ে যেত বছরের পর বছর। আমি ছয় মাসের মধ্যে নার্সারি শেষ করে ক্লাস ওয়ানের পড়া শুরু করি।
গাদন বলত, আমাকে মনে হয় আর রাখবে না। আমি তো পড়া পারি না।
কিন্তু ও ভীষণ ভালো গান গাইতে পারত। আর পারত তবলা বাজাতে। ওর কাছেই আমি শিখেছিলাম পল্লীগীতি–কলকল ছলছল। পাহাড়ি গান যখন ও গলা ছেড়ে গাইত, আমরা যেন ওর পাহাড়ের দেশ, ওর আদিবাসী বাবা-মা-ভাইবোন, ওর জুমচাষের ক্ষেত–সব কল্পনা করতে পারতাম।
একদিন গাদন বলে, আমি চলে যাচ্ছি। আর আসব না।
কই যাইতেছ? আমি বিস্মিত।
'বললাম না, আমি যে পড়াশোনা পারি না। আমাকে আর রাখবে না।' গাদনের কণ্ঠে উদাসভাব।
গাদনের সঙ্গে কিন্তু ভূত ছিল। ও সব সময় মাথা নাড়ত। আমরা যখন ওর গলা ধরে হাঁটতাম, টের পেতাম ওর মাথা নড়ছে। আর ও রাতে ঘুমাতে যাবার জন্যে বিছানায় শুইত, পরে দেখা যাইত ও বাইরে বারান্দার মেঝেতে শুয়ে আছে।

ও নাকি খুব সুন্দর ছিল দেখতে। সবাই বলত। ম্যাডামরা বলতেন, গাদন তো খুব সুন্দর। আমাদের মধ্যেও কয়েকজন ছিল লো-ভিশন, ক্ষীণদৃষ্টি। ওরাও ওকে দেখে বলত, ও খুব সুন্দর। সবাই তাই বলত, ওর সাথে পরী আছে। ও নিজে এইসব করে না। পরীরা ওকে দিয়ে করায়া নেয়। গাদনও প্রতিবাদ করত না। ওর আরেকটা অভ্যাস ছিল, মাঝেমধ্যে গুম হয়ে থাকত। আমি হয়তো কিছু বললাম, ও দশ মিনিট পরে হঠাৎ বলত, কী বলছিলা জানি।

সেই গাদন চলে যায় স্কুল ছেড়ে। স্কুলের সবারই মন খারাপ করে দিয়ে যায়। জানি না, ও এখন কোথায় আছে কেমন আছে। ২২ নম্বর গেলাস এখন আমি নিজেই চিনে নিতে পারি, নিচের লেখাটা নিজে নিজেই পড়তে পারি। ব্রেইল এখন আমার নখস্থ। কিন্তু গাদন আর আমার জীবনে কোনো দিনও ফিরে আসবে না।

আমি একবার পাহাড়ে বেড়াতে গেছিলাম। আমার নেশা হলো পাহাড়ে চড়া। চড়া ছাড়া পাহাড় দেখে তো আমি কিছু বুঝবই না। পাহাড়ে উঠে আমি চিৎকার করে ডাকলাম: গাদন গাদন। পাহাড়ে পাহাড়ে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসল। না গাদনের সাড়া পাওয়া গেল না।

আস্তে আস্তে আমি পড়তে শিখতেছি। আমার নাম আনু। সন্ধ্যা হলো। হাঁস-মুরগি ঘরে তোলো। দাদিকে ওষুধ দাও। প্রাইমারি স্কুলের বাংলা বই আমার বই-ই ব্রেইল করে আমাদের পাঠ্যবই বানানো হয়েছে। বিডিএফ নামের একটা সংগঠনের কাছে এই ধরনের বই পাওয়া যেত। স্যালভেশন আর্মি এইসব বই কিনে আনে। আমরা পড়ি। কমলাফুলী কমলাফুলী কমলালেবুর ফুল, কমলাফুলীর বিয়ে হবে কানে মালার দুল।

আমাদের স্কুলবাড়িটাতে সত্যি সত্যি ভূত ছিল। আমি একদিন ঘুমাইছি নিজের দোতলা খাটে। রাতের বেলা স্যার এসে হিসাব করে দেখছেন সবাই যে যার জায়গায় আছেন কি না। ওরা দেখে কী, আমি নাই। বিছানায় তো নাই নাই, কোথাও নাই। খোঁজ খোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আমাকে পাওয়া যায় দোতালায় ক্লাসরুমের বেঞ্চে শুয়ে আছি, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্যার আমাকে কোলে করে নিচে এনে বিছানায় শোয়ায়। আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না। পরের দিন স্যার বলেন, তুমি দোতলায় গিয়ে শুয়েছিলে কেন? আমি কী বলব। আমি তো কিছুই জানি না।

আমাদের স্কুলবাড়িটা ছিল ভাড়াকরা বিল্ডিংয়ে। চারতলা বিল্ডিংয়ের দোতলা আর নিচতলায় ছিল আমাদের স্কুল। চারতলায় থাকতেন বাসাওয়ালা মহিলা। সেই মহিলা কী কারণে নিচে কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা বাথরুমে এসেছিলেন। সেখানে তার লাশ পাওয়া যায়। এই খবর শুনে আমরা তো ভয়েই বাঁচি না।

বাড়িতে পুলিশ আসে। আমাদের স্কুল কম্পাউন্ডটা ঘুরে ঘুরে দেখে।

ক্ষীণদৃষ্টির বন্ধু আর দারোয়ানের কাছে আমরা শুনতে পাই।

এই ঘটনার পর আমরা বেশ কিছু দিন খুব খুব ভয়ে ভয়ে থাকি। এমনিতেই দিন আর রাতের পার্থক্য আমাদের কাছে খুব কম। কিন্তু রাত মানে নীরবতা, নির্জনতা। স্তব্ধতা। নিজের পায়ের শব্দ পেয়ে নিজেই চমকে ওঠা। আমরা ভয়ে রাতে বিছানা ছেড়ে উঠতাম না, বাথরুম পেলেও না।

ঈদে বা গ্রীষ্মের ছুটিতে আদমজী যেতাম। বাড়ি গেলে অন্য রকম আদর। আব্বা আমাকে নিয়ে যেতেন দোকানে। কিনে দিতেন নতুন নতুন কাপড়। দোকানে কাপড় মেলে ধরে আব্বা বলেন, বাবা, এই কাপড়টা নিবা, নাকি এইটা। আমি হাত দিয়ে নেড়ে কাপড়ের জমিনটা কেমন বোঝার চেষ্টা করি। জিজ্ঞাসা করি কী রঙ। তারপর একটা পছন্দ করি নিজেই। বলি, আব্বা এইটা।

হুজুর চাচা আসতেন বাসায়। আমার পড়ার খোঁজখবর নিতেন। প্রত্যেকবার দেখলে বলতেন, এই তো আবুল হাশেম আজাদ অনেক বড় হইয়া গেছে। হইব না! পড়াশুনা করতেছে যে!

আমি আমার ছোট বোন দুটোর সাথে বউছি খেলতাম।

ছুটির পর আদমজীর বাসা থেকে স্কুলে আসতে ইচ্ছা করত না। প্রতিবারই মনে হতো, এই যন্ত্রণা আর ভালো লাগে না। লেখাপড়ার এই দুর্বহ বোঝা আর টানতে পারব না। কিন্তু আসতেই হতো। আম্মা দিয়ে যেতেন।

ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষায় চতুর্থ হই আমি। ক্লাস টুয়ের পরীক্ষায় ফার্স্ট। শুধু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নয়, আমাদের ব্লাইন্ড স্কুলের পাশেই ছিল খ্রিষ্টান এতিম বাচ্চাদের আশ্রম। ওই স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক। ওদের পরীক্ষা আমাদের পরীক্ষা হতো একই সঙ্গে। সবার মধ্যেই প্রথম হই আমি।

একদিন শাইখ সিরাজ আসেন আমাদের স্কুলে।

ক্লাসে স্যার বলেন, আজাদ, ক্লাস শেষ হয়ে গেলে তুমি অফিসে আসো।

আমি অফিসে যাই ।

গিয়ে বুঝি, আরেকজন কেউ বসে আছেন। তিনি আমাদের স্কুলের কেউ নন।

তিনি বললেন, তোমার নাম কী?

আমি বললাম, আবুল হাশেম আজাদ। আপনার নাম কী?

উনি বলেন, আমার নাম শাইখ সিরাজ। এই ছেলে তো স্মার্ট আছে। একে দিয়ে হবে। এই তুমি কোনো কবিতা জানো।

আমি বললাম, জানি।

পড়ো তো।

আমি কবিতা পড়তে লাগলাম, আমাদের ছোট নদী, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে।
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি
দুই পাড় উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি...

কবিতাটা শেষ হলে শাইখ সিরাজ বলেন, বাহ্। খুব ভালো পড়েছে। দেখি তো রেকর্ড হলো কি না। একটু চেক করে নিই।

উনি কিছুর বোতাম টেপেন (অবশ্যই ক্যাসেট রেকর্ডারের), আর আমার নিজের গলায় কবিতাটা বাজতে থাকে।

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে।
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি
দুই পাড় উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি...

হয়েছে। রেকর্ড হয়েছে। ভালো হয়েছে। উনি বলেন।

আমার অবশ্য নিজের গলা শুনে তেমন ভালো লাগে না। আসলে আমার কণ্ঠস্বর বদলে যাইতেছে। নিজের কাছেই গলাটা কেমন অচেনা লাগে। আসলে আমি বড় হইতেছি। নাকের নিচে ঈষৎ গোঁফের রেখা, হাত দিলে টের পাই। জুলফির নিচটাতে সামান্য দাড়িও উঁকি দিচ্ছে। এই সময়টায় কেন যে আমার কবিতা রেকর্ডিং করতে আসল। আর কয়েকটা দিন আগে আসলেই তো আমার কণ্ঠস্বরটা সুন্দর পাইত রেকর্ডিংয়ে।

শাইখ সিরাজ বলেন, তোমার কবিতাটা আগামী শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটায় রেডিওতে ঢাকা ক-তে প্রচারিত হবে। ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রোগ্রামে। তুমি শুনবে।

জি আচ্ছা।

উনি চলে যান। আমার কী যে উত্তেজনা! কখন আসবে শুক্রবার। কখন। অফিসে গিয়া বলি, বাসায় ফোন করে দেন। শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটায় রেডিও শুনতে। আমার কবিতা শুনাবে।

হ্যাঁ। কবিতাটা প্রচারিত হয়েছিল।

রেডিওতে প্রচারের সময় নিজের কণ্ঠটা ভালোই লেগেছিল শুনতে।

এরপর থেকে কবিতা আবৃত্তির একটা নেশা আমার মধ্যে তৈরি হয়।

আমি কবিতা সুযোগ পাইলেই পড়ি।

কিন্তু আমার মতো দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সুযোগ পাওয়াটাও কিন্তু কঠিন। আমি চাইলেই এখন জীবনানন্দ দাশের একটা কবিতা পড়তে পারব না। কারণ ব্রেইলে তার কবিতার বই পাওয়া যায় না।

'৯৪-র সালে বিশ্বকাপ শুরু হয়। সবাই মিলে আমরা ডাইনিং-রুমের টিভির সামনে বসি। কথাটা আপনাদের কাছে হয়তো অদ্ভুত লাগবে। কিন্তু আমরা দেখলামই বলি। টিভির সামনে বসে থাকি। ধারাবিবরণী শুনি। গোল হলে উত্তেজনায় ফেটে পড়ি। '৯৪-এর বিশ্বকাপ অবশ্য আর্জেন্টিনার জন্যে ভালো হয় না। খারাপ হয়। খুব খারাপ। ম্যারাডোনা ম্যারাডোনা করে গলা ফাটাইতেছি আমি। আম্মাকে বলে ম্যারাডোনার একটা পোস্টার এনে লাগাইছি বিছানার পাশে। আর সেই ম্যারাডোনাকেই কিনা বাদ দিয়ে দিল। কী নাকি ওষুধ খাইছে! এইটা একটা ষড়যন্ত্র! স্রেফ ষড়যন্ত্র! দুঃশালা খেলাই দেখব না। ম্যারাডোনার জন্যে সবাই মিলে গোল হয়ে কান্না জুড়ে দেই।

একই ভাবে আমরা টিভিনাটক দেখি।

৮.

আমি তখন ক্লাস থ্রিতে। কিন্তু এরই মধ্যে আমার বয়স ১৫/১৬ হয়ে গেছে। গালে হাত দিয়ে দেখি, দাড়ির মতো কী উঠছে। ক্লাস থ্রির ছাত্র, গালে দাড়ি, নাকের নিচেও গোঁফের রেখা, হাত দিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়! একদিন ক্লাসে এক

আপা বলেন, আজাদ, তুমি তো বেশ বড় হয়ে যাচ্ছ।
শুনে খুব লজ্জা পাই। মনে হয়, আপা আমার দাড়ি গোঁফের জঙ্গলগুলোর কথাই বলতেছেন।
এখন কী করা যায়?
আমাদের সঙ্গে আমার চেয়েও সিনিয়র ছেলে আছে। মাসুম, ফজলু, জুলহাস–এরা। এরা করে কী, নিয়মিত দাড়ি কামায়।
আমরা সেটা নিয়া এতদিন ফিসফাস করছি।
এখন তো মনে হইতেছে, আমাকেও দাড়ি কামাতে হবে। পরিষ্কার হয়ে ক্লাসে যাইতে হবে।
জুলহাসকে জিজ্ঞাসা করি, জুলহাস তুই শেভ করিস কী দিয়া?
জুলহাস বলে, বঁটি দিয়া।
বঁটি দিয়া? যাহ্। আরে দোস্ত ক না। কী কিনা আনতে হইব?
জুলহাস বলে, এইটা কোনো জিজ্ঞাস করার বিষয় হইল। শেভ করবি রেজর দিয়া।
গিয়া দোকানে কী বলব?
বলবি, রেজার দেন। ওয়ানটাইম রেজার।
দাম কত নিব?
১২ টাকা।
আমি গেটের দারোয়ানকে এই দোকানে যাইতেছি বলে স্কুল চত্বর থেকে বার হয়ে নিকটবর্তী দোকানে যাই আর জুলহাসের শিখায়া দেওয়া পদ্ধতিতে রেজর চাই। ১২ টাকা দিয়ে রেজর কিনা আনি।
তারপর বাথরুমের বেসিনে দাঁড়ায়া গালে শুধু পানি মেখে শেভ করি।
দাাড়ি-গোঁফ দুইই।
সেই থেকে আমার নিজের দাড়ি কামানোর কাজটা আমি নিজেই করি। না কোনো অসুবিধা হয় না। পারি তো।

৯.

ক্লাস ফাইভের রেজাল্ট বের হয়। ফার্স্ট হইতে পারি নাই। সেকেন্ড হইছি। কারণ ফাইভে উঠছি ফোরে না পড়েই। ফাইভে একই সঙ্গে ফোরের বইও পড়তে হইছে। স্বপন ফার্স্ট হইল।
স্যালভেশন স্কুলের পাট চুকে যায়। এই স্কুলে প্রাইমারি লেভেল পর্যন্তই পড়ানো হয়। এবার হাইস্কুলে যাইতে হবে। কিন্তু পড়বটা কোথায়?
বাংলাদেশের সব স্কুলে অন্ধদের পড়ার ব্যবস্থা নাই। সুযোগও নাই। থাকা উচিত। অন্ধরা আলাদা স্কুলে পড়লে পরে সমাজজীবনে অন্যদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে, তাল মিলিয়ে চলতে তাদের অসুবিধা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ স্কুলেই অন্ধদের ভর্তি নেওয়া হয় না।
অতি অল্পসংখ্যক স্কুলেই নেওয়া হয়। এই রকম স্কুল আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।
স্বপন চলে গেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, তার বাড়িতে। ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই পড়বে।
আমাদের গ্রামের বাড়ি যেহেতু কুমিল্লায়, কথা ওঠে, আমি পড়ব কুমিল্লাতেই।
কিন্তু আমি বলি, আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পড়তে চাই।
এবিসি (অ্যাসিস্টান্স ফর ব্লাইন্ড চিলড্রেন) কর্তৃপক্ষ রাজি হয়। আম্মাও রাজি।
১৯৯৬ সালের শীতকালে আমরা রওনা হই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। বাসে করে। প্রথমে নারায়ণগঞ্জ থেকে বাসে গুলিস্তান। সেখান থেকে সরাসরি বাস ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
রিকশা করে আমি আর আম্মা আসি স্কুল চত্বরে।
প্রথমে যাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে।
আমি বলি, আম্মা, আমরা কোথায় আসলাম?
আম্মা বলেন, এইটা হইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইস্কুল।
আমরা হাঁটি।
আমি বলি, আম্মা, স্কুলটা কেমন?
ভালো।
বিল্ডিংগুলা কেমন?

ভালো।
শুধু ভালো বললে হয়। একটু বর্ণনা দ্যাও।
কী বর্ণনা দিমু?
আগেরটার চাইতে ভালো, না খারাপ?
আগেরটার চাইতে ভালো। আম্মার গলায় উদ্বেগ।
আম্মা তখন ঠিক কথা বলেননি। সেটা বুঝেছি আরও পরে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ে স্যালভেশন আর্মির স্কুলটা বেশি উন্নত ও আধুনিক ছিল।
তবে এই স্কুলের মাঠটা বড়। আর বড় সংলগ্ন পুকুরটা।
অফিসে গিয়ে ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা শেষে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় হোস্টেলে।
আছমাতুন্নেসা এবিসি অন্ধ ছাত্রাবাস।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক দানশীল ব্যক্তি, তিনি ছিলেন প্রথম মুসলমান ব্যারিস্টার, তার স্ত্রীর নামে একটা ট্রাস্ট করে গেছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলখানার পাশেই বিশাল জায়গা তিনি দান করে গেছেন মানুষের কল্যাণের জন্যে। এখানে যেমন তারই জায়গায় গড়ে উঠেছে আছমাতুন্নেসা অন্ধ ছাত্রাবাস। তবে এই ছাত্রাবাস পরিচালিত হয় এবিসির মাধ্যমে।
এইসব কথা আমি জানতে পারব আরও পরে।
আম্মা আমার হাত ধরে নিয়ে যান হোস্টেলের সুপারভাইজারের কাছে।
সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় থাকার রুমে। রুমে ঢুকতেই নাকে এসে লাগে এক রকমের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। বুঝতে পারি, ঘরটা একটু অন্ধকার আছে। পাশাপাশি ছোট ছোট খাট। একটাই বড় রুম। সবাই এই রুমেই থাকে। জনা ১৫ জন অন্ধ ছাত্র। সবাই পড়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইস্কুলে। এই স্কুলে দৃষ্টিমান ছেলেরাও পড়ে। তাদেরই পাশাপাশি পড়তে হবে আমাদের।
কেউ একজন এসে আমার হাত ধরে। কি রে, কখন আইলি?
স্বপনের গলা। আমি ওর হাতটা শক্ত করে ধরে বলি, এই তো অল্পক্ষণ।
ভর্তি হইছিস?
হইছি।
আম্মা বলেন, বাবা স্বপন। তোমার জন্যে পাগলাটা এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইলো। তুমি ওরে দেইখা রাইখো।
জি, খালাম্মা। আপনে কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা তো আছি।
আম্মা আশ্বস্ত হন কি না জানি না। তিনি বিদায় নিয়ে চলে যান।
আমি রত্নার দেওয়া কলমদানিটা রাখি আমার টেবিলে।

১০.
শুরু হয় আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জীবন।
নানা বয়সের জনা ১৫ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছেলে এই হোস্টেলে থাকে। কেউ কেউ প্রাইমারি ক্লাসেও পড়ে।
পাশেই ডাইনিং রুম। আয়া আছে। তারা রাঁধে।
এইখানে এসে শুরু হয় খাওয়ার কষ্ট। খাবারের মান খুব খারাপ। একটা মুরগি রেঁধে খাওয়ানো হয় ১৭/১৮ জনকে।
পাশেই মসজিদ। মিরপুর স্যালভেশন স্কুলে ছিল প্রার্থনাঘর। এখন মসজিদ। আগে প্রার্থনা করতে হতো, এখন নামাজ পড়তে হয় পাঁচ ওয়াক্ত।
তবে এই হোস্টেলের বৈশিষ্ট্য হলো, এটা মাটির অনেক কাছাকাছি। হোস্টেল ভবন থেকে নামলেই মাটির উঠান। সেটা বেয়ে যেতে হয় মসজিদে বা স্কুলে। উঠানের একদম লাগোয়া একটা বিশাল পুকুর।
এই পুকুরের সঙ্গে আছে আমাদের নানা স্মৃতি। আমরা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা, আমাদের চোখে দেখতে-পাওয়া সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে এই পুকুরে ছিপ ফেলে অনেক মাছ ধরছি। ছিপ ধরে বসে থাকতাম। মাছে টোপে ঠোকর দিলেই বুঝতাম এসে গেছে। সুতো বেয়ে ছিপ বেয়ে ফাতনার কাঁপন বিদ্যুতের মতো এসে সংকেত দিত আমাদের হাতে। ঠিক যখন মাছটা টোপ গিলে ফেলছে, অমনি মারো টান।
মিরপুর স্কুলেও পুকুর ছিল। ওইখানে আমরা পুকুরে নেমে হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরতাম। একদিন কুরবান একটা বড়সড় মাছ ধরে মনের আনন্দে হোস্টেলের দিকে আসছে। হঠাৎ দারোয়ান দানিয়েল চিৎকার দিয়ে ওঠে, ও কুরবান,

কী করছ, সাপ সাপ, ছাড়।
কুরবান ছুড়ে মারে সাপটাকে। আমরা হইচই শুনে লাঠি নিয়ে ছুটি। আমরা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাই সাপটাকে মেরেছিলাম। আন্দাজেই। আন্দাজেই আমরা কত কী যে করতে পারি!
নতুন স্কুল ভালোই লাগতেছে। কিন্তু প্রথম প্রথম খানিকটা অসুবিধাও হইত। কারণ স্যাররা পড়াইতেছেন দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন উভয়ের জন্যে। আমাদের ক্লাসে আমরা মাত্র দুইজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এদের কথা সব সময় স্যারদের মনে থাকত না। স্যার হয়তো বললেন, এই ১৩ নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা লেখ।
এখন ১৩ নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চ্যাপ্টার কোনটা, আমরা তো জানি না। বা কোনো স্যার হয়তো বোর্ডে অঙ্ক কষতেছেন, মুখে বলে দিতেছেন না। আমাদের অসুবিধা হইত। আমরা হয়তো দাঁড়ায়া বলতাম, স্যার কী লিখলেন। তখন স্যারদের হুঁশ হইত।
এই স্কুলে আমাদের লেখাপড়া এইট পর্যন্ত ব্রেইল পদ্ধতিতেই হইছে। ক্লাস সিক্সের পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম। স্বপন সেকেন্ড। তখন আমাদেরকে আবার ডাবল প্রমোশন দিয়া এইটে তুলে দেওয়া হলো। আমাকে আর স্বপনকে।
আমাদের রেজাল্ট সব সময় ভালোই হইত। একবার তো প্রশ্নই ওঠে, আমাদের স্যারেরা নিজেরাও যেহেতু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, তারা আমাদেরকে বেশি নম্বর দেন কি না। তখন আমরা বলি, ঠিক আছে, আমরা রাইটার নিয়া পরীক্ষা দেব। অন্য স্যাররা খাতা দেখবেন। দেখা যাক, এবার কারা ভালো করে।
তা-ই করা হয়। আমরা রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দেই। মানে পরীক্ষার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম ছোট ক্লাসের একজন ছাত্র। সে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখে অনুচ্চ স্বরে আমার কানে কানে প্রশ্ন পড়ে শোনায়। আমিও একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর তার কানে কানে বলতেছি, আর সে লিখতেছে। সঠিক লিখছে, নাকি বেঠিক লিখছে, বানান ঠিকভাবে লিখতে পারছে কি না, জানি না। এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে সময় বেশি লাগে। বেশির ভাগ সময়েই ৫/১০ নম্বর ছেড়ে আসতে হয়। নিজে নিজে লেখা এক কথা। আরেকজনকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া আরেক কথা।
এইভাবেই পরীক্ষা দেই আমরা। আমি আর স্বপন। ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিলে তার খাতা আমাদের স্কুলের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ভুঁইয়া স্যারের কাছে যেত, উনি ছাড়া আর কেউ সেই খাতার মর্ম উদ্ধার করতে পারতেন না।
এবার খাতা যায় অন্য পরীক্ষকের হাতে।
এইবার আমরা, আমি স্বপন, আরও বেশি নাম্বার পাই।
সবাই মেনে নেই, এই দুইজন রীতিমতো ভালো ছাত্র।
মনোরঞ্জন স্যার তো ক্লাসে দৃষ্টিমান ছেলেদের নানাভাবে তিরস্কার করতেন, বলতেন, কানা-ডা পারে আর তোরা পারস না, মর মর, তোরা লজ্জায় মর।
আরেকবার আরেক কাণ্ড ঘটল। আশুতোষ স্যার আমাদের অঙ্কের শিক্ষক।
আমি পড়ি ক্লাস সিক্সে। স্যার পড়াইতেছেন ক্লাস সেভেনে।
একটা অঙ্ক দিছেন ব্লাকবোর্ডে। কেউ পারতেছে না।
আশুতোষ স্যার ওই ক্লাসের ক্যাপ্টেনকে পাঠায়া দেন আমাকে ডেকে আনতে। আমি যাই। স্যার বলে, আজাদ। একটা অঙ্ক কষো তো বাবা। চৌবাচ্চার অঙ্ক। একটা চৌবাচ্চা একটা ফুটা দিয়া খালি হইতে লাগে এক ঘণ্টা। আরেকটা ফুটা দিয়া খালি হইতে লাগে ৩০ মিনিট। দুইটা ফুটা একসঙ্গে ছাড়লে চৌবাচ্চা খালি হইতে কয় মিনিট লাগবে।
আমি বলি, স্যার, এক মিনিটে কত অংশ খালি হয় দুইটাতেই বার করে নেন। তারপর দুইটা যোগ দেন।
তাইলে দুইটা একসঙ্গে ছাড়লে খালি হয় এত অংশ। পুরাটা খালি হয় কত মিনিটে। সহজ।
স্যার লেখেন। আমি হিসাব করে করে বলি কত হবে। উত্তর আসে কুড়ি মিনিট।
স্যার বলেন, এই সবগুলানের কান ধরে টেনে দে।
আমি দেই না।
স্যার উল্টা আমারই কান টেনে দিয়া বলেন, কানে টানতে কই কথা গায়ে লাগে না। তাইলে অগো হইয়া তুই কানমলা খা।
খেলুম। তাতে যদি ক্লাস সেভেনের ছেলেদের সঙ্গে আমি যে পাপ করছি, তার যদি কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। এমন কানমলা খাইতেও মজা।

১১.

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হোস্টেলের সঙ্গে লাগানো পুকুরপাড়টা শান বাঁধানো। পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে পুকুরে, সিঁড়ির দুই পাশে দুটো পাকা বেঞ্চ। আমরা এই জায়গাটাকে বলি ঘাটলা। এই ঘাটলায় বসে কত যে গল্প করছি। শুধু হোস্টেলের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা নয়, ক্লাসের দৃষ্টিমান সহপাঠীদের সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছল অনেক। হেলাল, রাসেল, অপু–কত কত বন্ধু যে ছিল আমাদের।

ওদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইতাম সিনেমা হলে।

সংলাপ আর আবহসংগীত আর গান শুনেই সিনেমা দেখার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি আমরা। আর পাশে বসে থাকা সাইটেড বন্ধুটিও মাঝেমধ্যে বলে বলে দেয়, কী হইতেছে।

একদিন বেড়াতে বার হইছি।

আতিক, অপু আর আমি।

আমি আর স্বপন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, অপু আর আতিক দেখতে পায়।

রেল সড়কের ওপর দিয়া হাঁটতেছি।

স্বপন গান ধরেছে, মন আমার দেহঘড়ি সন্ধান করি, কী মিস্ত্রি বানাইয়াছে, মন আমার দেহঘড়ি...

অপু বলে, এই, এর পরে আমরা কিন্তু ব্রিজের উপরে উঠতাছি। সাবধান। লাইন ধইরা চল। নাইলে পইড়া যাইতে পারস। ধরুম?

না ধরতে হইব না। পারুম আমরা। আমি বলি।

রেললাইনের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলা আর শরীরের ব্যালান্স রাখা, কোনো কঠিন কাজ নয়। আমরা পা ফেলতেছি ধীরে ধীরে।

অপু বলে, এই, আমরা এই পারে চইলা আইছি। তোরা ধীরে ধীরে আয়।

স্বপন বলল, আমরা অহন কোনহানে?

আতিক বলল, মাঝহানে।

আমরা তাহলে ব্রিজের ঠিক মাঝখানে।

হঠাৎ অপুর চিৎকার, এই ট্রেন আসতাছে এই ট্রেন আসতাছে।

আমি ভাবি, ইয়ারকি করছে নিশ্চয়ই।

এরপর আতিক অপুর মরণপণ চিৎকার, এই আজাদ, এই স্বপন, ট্রেন আসতেছে....লাফ দে লাফ দে...

ট্রেনের শব্দ আমরা শুনতে পাইতেছি। ট্রেনটা বাঘের মতো গর্জন করতে করতে ছুটে আসতেছে আমাদের দিকে। আমরা এখন আগাব, নাকি পিছাব। চোখে দেখি না, চারদিক অন্ধকার। শুধু শুনতে পাইতেছি ওই আগায়া আসতেছে আজরাইলটা, ট্রেনের রূপ নিয়া। সমস্ত ব্রিজ কাঁপতে শুরু করছে। এখন কী করব?

আম্মার কথা মনে পড়তেছে, বড় আপার কথা। ছোট বোন দুইটার কথা। ভাগ্নে-ভাগ্নির কথা। আজকেই শেষ।

ট্রেনটা হুইসেল বাজাইতেছে। খুব কাছে যে এসে গেছে, বোঝাই যাইতেছে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী কাঁপতেছে। শব্দে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

সেই আওয়াজের মধ্যে অপু আর আতিক কী যেন বলতেছে, হারায়া যাইতেছে। খালি বোঝা যাইতেছে ওরা কিছু একটা বলতেছে।

মৃত্যু এসে শ্বাস ফেলতেছে আমাদের ঘাড়ে। আমরা এখনই কোথায় ছিটকে পড়ব ট্রেনের ধাক্কায়।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি।

স্বপনের হাতে ধরে বলি, স্বপন, লাফ দে। রেডি ওয়ান টু থ্রি...

দুই জনে লাফ দেই। ব্রিজের নিচে পড়ি। গলা পর্যন্ত পানি। সাঁতার জানি না, ডুবে যাইতে ধরি। তারপর পায়ের নিচে মাটি পাই।

বুক ধকপক করে কাঁপতেছে।

বেঁচে আছি।

ট্রেনটা শব্দ করে চলে যাইতেছে। তার গর্জন মিলায়া যাইতেছে দূর দিগন্তে।

অপু আর আতিক চিৎকার করতেছে, এই দিকে আয়। এই দিকে আয়।

ডাঙায় উঠে দেখি, পা কেটে গেছে আমার। রক্ত বার হইতেছে।

১২.

ছুটিতে বাসায় আসছি। আদমজীর বাসায়। এপ্রিল মাস। প্রচণ্ড গরম। এরই মধ্যে মালয়শিয়ায় জমে উঠেছে আইসিসি ট্রফি। বাংলাদেশ খেলতেছে। এইবার যদি বাংলাদেশ তৃতীয়ও হয়, বিশ্বকাপ ফুটবল খেলতে পারবে। এর আগের বার অল্পের জন্যে বাংলাদেশ এই চান্সটা মিস করছিল। সেইবার খেলা হইছিল জিম্বাবুয়ের সঙ্গে।

এবার বাংলাদেশের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। বাংলাদেশ ভালো করতেছে। আর সারা দেশের মানুষ খেলাটা ফলো করতেছে রেডিওর মাধ্যমে। টিভিতে এই খেলা দেখাইতেছে না। সবাই রেডিও শোনে। আমিও শুনি। এতে আমি মনে মনে খুশিই। কারণ টিভিতে খেলা দেখাইলেও তো আমার কোনো লাভ নাই। আমি তো ধারাবিবরণী শুনেই খেলা দেখার স্বাদ মেটাই।

বাংলাদেশ হল্যান্ডের কাছেই বুঝি হেরে যায়! এর আগে প্রস্তুতি ম্যাচেও হারছে হল্যান্ডের কাছে। অথচ হল্যান্ড আজকে করেছে মাত্র ১৭১। বৃষ্টির কারণে একসময় টার্গেট দাঁড়ায় ৩৩ ওভারে ১৪১ রান। বৃষ্টির আগে বাংলাদেশ করছে ১৮.৫ ওভারে ৫৬ রান। এখন করতে হবে ১৪.১ ওভারে ৮৫ রান। বলে বলে রান দরকার। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা আউট হয়ে যাইতেছে ধপাধপ। ৮৬ রানে ৬ উইকেট পড়ে যায়। আর বুঝি হলো না। আশা ছেড়ে দেই। আল্লাহকে ডাকি। আল্লাহ কানার ডাক শুনতে পায়। ক্যাপ্টেন'স নক খেলে আকরাম খান। অপরাজিত ৬৮। বাংলাদেশ জেতে ৩ উইকেটে। আজকা হারলে এইখান থেকেই বিদায় নিতে হইত। বাঁচায়া দিল আকরাম খান।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচটা জেতার পর চোখে পানি চলে আসে।

স্কটল্যান্ডের কাছে যেইদিন জিতল বাংলাদেশ, নিশ্চিত হয়ে যায় বিশ্বকাপ খেলাটা, সেই দিন গলা ফাটায়া চিৎকার করতে করতে বাসার বাইরে চলে আসি।

আদমজী মিল এলাকার হাজার হাজার ছেলেও নেমে আসে ঘরের বাইরে।

রাস্তার মধ্যে থালাবাসন বাজাইতে থাকে। কী মজাটাই না করি!

এরপর আসে ফাইনাল! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কেনিয়ার সঙ্গে।

যদিও এর আগেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ নিশ্চিত হয়ে গেছে, তবু ফাইনাল খেলা নিয়া ব্যাপক উৎসাহ আমাদের মধ্যে। আমি, বাবু, রোজি, জেসমিন–সবাই উত্তেজিত!

রেডিওতে খেলা শুনছি। কেনিয়া খুব ভালো রান করে। তারপর বৃষ্টি। ঠিক হয়, এক দিনের ম্যাচ হবে দুই দিনে। আগামীকাল মাঠে নামবে বাংলাদেশ।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ছোট করা হয়। ২৫ ওভার খেলবে বাংলাদেশ। টার্গেট দেওয়া হয় ১৬৬ । রফিককে দিয়ে ওপেন করানো হয়। নেমেই ছক্কা পেটায় রফিক। কী উত্তেজনাকর ম্যাচই সেটা হইছিল বাবা। শেষ পর্যন্ত শান্তর লেগ বাইয়ে জয়সূচক রানটা আসে। ২ উইকেটে জেতে বাংলাদেশ।

আমার নাচ দেখে কে?

রাস্তায় গিয়া বিপুল নারী-পুরুষ-তরুণের আনন্দমিছিলে আমিও যোগ দেই।

১৩.

আজকে আমাদের হোস্টেলে আস্ত খাসি কুরবানি দেওয়া হবে। ছাগলটা বাঁধা আছে নারকেলগাছের গোড়ায়। ভ্যা ভ্যা করছে। এটা আসছে এবিসির মাধ্যমে, কোনো একজন দানশীল ভদ্রলোক দিয়ে গেছেন।

ছাগলটা এত ভ্যাবাইতেছে কেন?

আমি বলি, এ স্বপন।

স্বপন বলে, কী রে আজাদ।

চল, ছাগলটারে কাঁঠাল পাতা পাইড়া খাওয়াই।

চল।

আমরা দুইজন বার হই। ঘাটলার কাছে যাই। ওইখানে একটা কাঁঠালগাছ আছে। আমরা জানি। ঘাটলার কাছে গিয়া শুনি নোমান আর মান্নাও ওখানে বসে আছে। গল্প করতেছে।

গাছের পাতা অনেক উপরে। আমি বলি, আমি গাছটা ধইরা থাকি। তুই আমার হাতের উপরে পাড়া দিয়া উঠ।

ও ওঠে। ডাল নাগালে পায়। সেই ডালটা ধরে ঝোলে। আমি দৌড়ায়া গিয়া পাতা ছিঁড়ি, ডাল ভাঙি।

নোমান মান্নাও আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়।

কাঁঠাল পাতা পেড়ে আমরা ছাগলটাকে দেই।

তারপর এসে বসি ঘাটলায়।
নোমান বলে, গত শুক্রবার যে মৃত্যুবার্ষিকীর দাওয়াত ছিল, আজাদ তুই যাইস নাই, হেভি খাওয়া দিছিল।
আমি বলি, আমার এইসব কাঙালি ভোজটোজ ভাল্লাগে না। আমি কি কাঙাল নাকি।
তাইলে যে ১৫ আগস্টের কাঙালিভোজের খিচুরি দিয়া গেল সেইটা যে খাইলি।
দিয়া গেছে। খাইছি।
স্বপন বলে, আজকার খাওনটা হেভি হইব। খাসির গোশত অনেকগুলান কইরা পাওয়া যাইব।
মান্না বলে, দুম্বার গোশতের চাইতে খাসির গোশতই ভালো।
আমি বলি, আরে দুম্বার গোশত তো আসে বাসি। প্রসেস করা। আর খাসিরে অহন কাঁঠালপাতা দিলাম, রাইতেই মাংস খামু। দুইটার দুই স্বাদ হইব না?
মান্না বলে, চল পুকুরে সাঁতার কাটি।
স্বপন বলে, না আমি সাঁতার জানি না। আমি নামুম না। আমি পানি ভয় পাই।
আমি বলি, আমি নামুম। পুকুরে তো কত নামছি। কিন্তু কিনারে থাকুম।
আমরা পানিতে নেমে পড়ি। মান্না, আমি, আর নোমান।
ওরা দুজনেই সাঁতার পারে। আমি খালি পারি না।
ওরা তাই পুকুরের মধ্যে চলে যায় পানিতে আলোড়ন তুলে। আমি কিনারে মাটিতে পা রেখে সাঁতারের ভান করি।
মান্না ফিরে আসে। বলে, আজাদ, তুই পুকুরের মধ্যে যাবি সাঁতার কাইটা?
পারি না, কইলাম না? আমি বলি।
আরে তোরে একটা সোজা বুদ্ধি শিখায়া দেই। পরনের লুঙ্গিটার মধ্যে বাতাস ভইরা লুঙ্গিটারে ফোলা। তারপর সেই ফোলা লুঙ্গির উপরে চইড়া ভাইসা থাকতে পারবি।
কেমনে?
এই যে এমনে!
আমি আর মান্না আমার লুঙ্গির নিচে বাতাস ঠেলি। দুই হাতে পানি ঠেলে ঠেলে। লুঙ্গিটা বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। আমি সেটার গোড়া এক হাতে চেপে ধরে আরেক হাতে সাঁতার কাটতে থাকি। বেশ মজা তো। মান্না আমাকে নিয়ে পুকুরের মাঝখানে চলে যায়। অনেক বড় পুকুর। অনেকক্ষণ লাগে যাইতে।
পুকুরের মাঝখানে যাবার পর লুঙ্গির বাতাস যায় বার হয়ে। আমি ডুবে যেতে থাকি। মান্নাকে জাপ্টায়া ধরি। মান্না চিৎকার করে, ছাড় ছাড়। আমি কি আর ওকে ছাড়ি। মান্না আমার কারণে আর সাঁতার কাটতে পারে না।
আমরা দুজন ডুবে যেতে থাকি।
তার আগে চিৎকার করে উঠি, নোমান। আমরা ডুইবা যাইতেছি। আমাদের বাঁচা।
নোমান পানিতেই ছিল। সে এদিকে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আমি পানির নিচে তলিয়ে গেছি। সমানে পানি খাচ্ছি। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছে। আমার নিচে মান্না।
আমরা দুই অন্ধ পানির নিচে। নোমান নিজেও অন্ধ।
আমরা কোথায় সে জানে না। কিন্তু ওই যে বলছি, শব্দ দিয়া, স্পর্শ দিয়া, গন্ধ দিয়া, বাতাসের আলোড়ন দিয়া আমরা বহুকিছু বুঝতে পারি, শনাক্ত করতে পারি, নোমানও সেই ক্ষমতাবলে সাঁতার কেটে চলে আসে আমাদের কাছে। আমাকে সে পায় পানির নিচে। টেনে তোলে। আমি মান্নাকে ছেড়ে দিলে মান্নাও পানির ওপরে ভেসে ওঠে।
নোমান বলে, আমার পিঠটা ধর হারামজাদা। হাত ছাড়। আমি তার হাত ছেড়ে পিঠ ধরি।
তারপর নোমান আমাকে পাড়ে নিয়ে আসে।
মান্নাও আসে। নিজে নিজে সাঁতরে।
পাড়ে উঠেই মান্না অজ্ঞান হয়ে যায়।
সেই রাতের খাসির মাংস রান্নাটা খুব ভালো হয়। আমি আমার ভাগের মাংস নোমানকে তুলে তুলে দেই। এই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছেলেটা আজকে আমাকে বাঁচাইছে।

১৪.

স্কুলে গেছি। যথারীতি ক্লাসে বসে আছি আমি আর স্বপন, পাশাপাশি।
থার্ড পিরিয়ডে পিয়ন হবিবর ভাই এসে বলে, হেড স্যার আজাদ আর স্বপন ভাইরে ডাকে।

আমাদেরকে? কেন?
যান। গেলেই বুঝবেন।
আমরা দুইজন হবিবর ভাইয়ের পেছনে পেছনে যাই হেড স্যারের ঘরে।
স্যারের দরজায় উঁকি দেই।
আসো, স্যারের গলা শোনা যায়।
আমরা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকি।
স্যার বলেন, আমি চাই তোমরা দুইজন বৃত্তি পরীক্ষা দিবা। আমি চাই ব্লাইন্ডদের মধ্যে কেউ বৃত্তি পাক।
আমি বলি, স্যার আমরা কি পারব?
স্যার বলেন, কেন পারবা না? তোমরা আমাদের স্কুলের ক্লাস এইটের ফার্স্ট বয় আর সেকেন্ড বয়। তোমরা বৃত্তি না পেলে আমাদের স্কুল থেকে কেউ পাবে না।
সৃপন বলে, স্যার তাইলে আজাদ দেক। আমি দিব না স্যার।
স্যার বলেন, কেন? দুইজনেই দ্যাও।
সৃপন বলে, না স্যার আমি দিব না। আজাদ দেক।
সৃপন কেন দিতে চায় না, সে-ই জানে। কিন্তু আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেব, এতে আমার ভেতরে একটা উত্তেজনার ভাব আসে। আমি পড়াশোনার মাত্রা বাড়ায়া দেই। বৃত্তি-বই কিনে আনি। আমার সাইটেড বন্ধু অপুকে বলি, রোজ যেন আমার সাথে এসে দুই ঘণ্টা করে পড়ে।
অপু কথা শোনে। ওও বৃত্তি পরীক্ষা দেবে। আমরা বিকালবেলা, সবাই যখন খেলছে, তখন আমাদের স্কুলের রিসোর্স রুমে এসে পড়তে বসি। অপু জোরে জোরে পড়ে, আমি শুনি। কারণ বৃত্তি বইটা ব্রেইলে পাওয়া যায় না।
রিসোর্স রুমটা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ একটা রুম। এই কক্ষে এবিসির দেওয়া অন্ধদের লেখাপড়ার বিশেষ উপকরণগুলো রাখা আছে। আমাদের রাইটিং গাইড, বিশেষ ধরনের স্কেল, বিশেষ ধরনের কম্পাস, ব্রেইল লেখার কাগজ, খেলার জন্যে ঝুমঝুমিওয়ালা বল, দাবা, কার্ড ইত্যাদি। কার্ড বা তাস, সেটাও অন্ধদের জন্যে বিশেষ রকমের পাওয়া যায়, তাতে প্রত্যেকটা তাসের কোনায় ব্রেইলে তাসটার পরিচিতি ও নম্বর লেখা থেকে।
এই কক্ষটা পরিচালনা করেন গনি স্যার, উনিও অন্ধ।
আমার বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি খুব ভালো চলতেছে। আমি অনেক পড়তেছি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে ব্রেইলের বইগুলো পড়ি।
কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দেয়। সেটা হলো, বৃত্তি পরীক্ষার খাতা তো আর ব্রেইলে লিখলে চলবে না। রাইটার নিয়ে লিখতে হবে। ব্রেইলে লিখলে সেই খাতা দেখবে কে? কাজেই আমার একজন রাইটার দরকার। তাকে হতে হবে বড়জোর ক্লাস সেভেনে পড়া।
আমি আর রাইটার খুঁজে পাই না। ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের ক্লাস সেভেনের কেউই রাজি হয় না আমার রাইটার হতে। সবাই বলে, আপনি যত ভালো ছাত্র, আমরা তো তত ভালো না। আমরা কি আর পারুম?
আম্মাকে চিঠি লিখি। আম্মা আমার জন্যে একজন রাইটার জোগাড় করো।
আম্মা আমাকে দেখতে আসেন। তার কাছ থেকে জানতে পারি, রাইটার জোগাড় হয়েছে। অনেক বলেকয়ে একটা মেয়েকে রাজি করানো গেছে। আম্মা তার অভিভাবকদের বুঝিয়েছেন, আমি তো যাবই ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ওখানে নিজে থাকব, আপনাদের মেয়ে আমার সঙ্গে যাবে, থাকবে, খাবে–সব খরচ আমি দিব, তারপর ও যে আমাদের জন্যে পরিশ্রম করতেছে, সেইটারও একটা পারিশ্রমিক সে পাবে, অসুবিধা কী? বৃত্তি পরীক্ষাটা কেমন করে হয়, আপনার মেয়ে সেটা দেখে শিখে ফেলবে। সামনের বছর ও নিজে যখন পরীক্ষা দেবে, তখন ওর উপকারে লাগবে। তাই না!
আম্মা মেয়েটার ছবি আনছেন। আইডি কার্ডের জন্যে জমা দিতে হবে।
মেয়েটার নাম শারমিন আক্তার। আমার উনিশ বছরের শরীরে মেয়েটার নাম শুনেই একটা গোপন ভালো লাগার বোধ খেলা করে যায়।
আমি চোখে দেখি না বলে মেয়েটার ছবি দেখতেও পারলাম না। আম্মাকে তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, আম্মা মেয়েটা দেখতে কেমন। ওর কণ্ঠসৃর কেমন।
আমরা যারা চোখে দেখি না, গলার সুর তাদের কাছে সৌন্দর্যের প্রধান মাপকাঠি। মিষ্টি সুরেলা সুভাষিত কণ্ঠসৃর

শুনলে আমাদের কাছে মনে হয়, এ-ই তো সুন্দর। আর কণ্ঠস্বর সুন্দর না হলে বা কথা ভালো না হলে তাকে প্রথম দফায় আমাদের সুন্দর বলে মনে হয় না।

১৫.

সবকিছু ঠিকমতো চলতেছে। স্যারদের আশা, এই প্রথম একজন অন্ধ ছেলে বৃত্তি পেয়ে একটা ইতিহাস রচনা করবে। পরীক্ষার আছে আর মাত্র দুই দিন বাকি। আম্মা চলে আসেন, সঙ্গে শারমিন। শারমিনের সঙ্গে কথা হয়। ওর কণ্ঠস্বর মোটামুটি ভালোই। ওকে সঙ্গে নিয়ে আম্মা আমাদের হোস্টেলের ঘাটলায় খানিকক্ষণ বসার পর বলেন, তুই পড় আজাদ, আমি ওকে নিয়ে হোটেলে যাই, হাতমুখ ধুই।

আমি বলি, এইখানেই হাতমুখ ধোও, পরে যাও। আম্মা শোনেন না।

পরীক্ষার আগের দিন অ্যাডমিট কার্ড আসে। দেখা যায়, সবার কার্ড আসছে, আমারটা আসে নাই। হেড স্যারের মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তিনি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ফোন করেন। তাকে নাকি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, এর আগে কোনো অন্ধ ছেলে বৃত্তি দেয় নাই, একজন পরীক্ষা দেবে, তার সঙ্গে আবার আরেকজন থাকবে রাইটার, এই রকম কোনো ঘটনা তো আমার জীবনে আগে ঘটে নাই। এইটার জন্যে ঢাকা থেকে স্পেশাল পারমিশন আনতে হবে। আমি চেষ্টা করছি।

কী চেষ্টা তিনি করেন, তিনিই জানেন। আমাদের হেড স্যার আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান ডিইও অফিসে, ডিইও ফোন করেন ঢাকায়, কী কথা হয় মাথামুণ্ডু উনিই জানেন, হেড স্যারকে বলেন, এইবার হবে না। আমি আগে থেকে লেখালেখি করে পারমিশন বার করে রাখব, সামনের বার আপনাদের স্কুল থেকে অবশ্যই ব্লাইন্ড ছেলেরাও বৃত্তি পরীক্ষা দেবে।

হেড স্যার বললেন, কোনো মানে হয়? আমার ফার্স্টবয় যদি পরীক্ষা দিতে না পারে, তাহলে অন্যদের পরীক্ষা দিয়ে লাভ কী!

আহা মন খারাপ করছেন কেন? সামনের বার তো ব্লাইন্ডরা সুযোগ পাচ্ছেই।

সামনের বার কি এত ভালো ছাত্র থাকবে? হেড স্যার ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে কথা কটা বলে আমার হাত ধরে হনহন করে বারায়া আসেন।

খুব মন খারাপ করে হোস্টেলে ফিরে আসি। আম্মা হোস্টেলে আসলে তাকে জানাই সব ঘটনা। আমার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হবে না। আম্মাও খুব মন খারাপ করেন। তারপর শারমীনকে নিয়ে চলে যান নারায়ণগঞ্জ।

তারপর আমি শুরু করি কান্না। বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে আমি অনেক কষ্ট করছি। প্রচুর নোট করছিলাম। সেইসব নোট বের করে নিয়ে এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুড়ে মারলাম হোস্টেলসংলগ্ন পুকুরের পানিতে।

আমার কান্নার চোটে পুরো হোস্টেলের সব ছেলে কান্দতে শুরু করে দেয়। সে এক গণকান্নার মহড়া!

আজ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের একটা বঞ্চনার দিন, এই সমাজ এই ব্যবস্থা একটা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছেলেকে বৈষম্যের শিকারে পরিণত করেছে, তারই প্রতিবাদে এই কান্না!

১৬.

ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই '৯৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখলাম। আমাদের হোস্টেলে টিভি ছিল না। একেক দিন একেকজন বন্ধুর বাসায় গিয়ে দেখতাম। আমাদের আর্জেন্টিনার সমর্থকদের জন্যে এটা খুবই বাজে একটা বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনা প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিল। ফলে প্রতিবার ব্রাজিল যার সঙ্গে খেলে, আমরা তাকে সমর্থন করতে লাগলাম। ফলে প্রায় প্রতিদিনই হারতে হলো। শেষ পর্যন্ত বিজয় এসে ধরা দিল, ফাইনালের দিনে। ফ্রান্স হারাল ব্রাজিলকে। ৩-০ গোলে। জিদান খুব ভালো খেলল।

হ্যাঁ, আমার বন্ধুরা সব বলে বলে দিল কী হচ্ছে না হচ্ছে আর আমিও খেলার ধারাবিবরণী শুনে অনেকটাই বুঝতে পারছিলাম খেলার গতি-প্রতিকৃতি।

আর আর্জেন্টিনার পরাজয়ে যখন ব্যথিত, তখনই শুনতে পাই, কারো ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজছে শচীনদেব বর্মণের গান: তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে...দিয়ে গেছ মরে শত পরাজয়, ফিরে এসো জয়রথে। আর্জেন্টিনার জয়রথে ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছি। সেই অপেক্ষার পালা এখনো শেষ হয় নাই। কবে যে হবে!

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পড়ার সময়েই স্থানীয় সিনেমা হলে আসে টাইটানিক। আমরা দল বেঁধে দেখতে যাই। দৃষ্টিমান ও

দৃষ্টিহীন বন্ধুরা। টাইটানিক আমি তিনবার দেখেছি। ডায়লগ শুনে বোঝার চেষ্টা করতাম। আর বন্ধুরা বুঝিয়ে দিত কোন দৃশ্যে কী ঘটছে। আমি অ্যাডাল্ট মুভিও দেখেছি। সেটা বন্ধুদের বাসায়। হয়তো কেউ বলল, চল আজ কালামদের বাসায়, ওর বাসা আজকে খালি আছে। গিয়ে সিডিতে ওইসব ছবি দেখতাম। বন্ধুরা বর্ণনা করত কী হচ্ছে না হচ্ছে।

বেড়াতে যেতাম প্রচুর। আশুগঞ্জ সার কারখানা এলাকায়। আর তিতাস নদীতে, নৌকায় চড়ে ঘুরতাম। বেড়াতে আমি খুবই পছন্দ করি। নৌকায় চড়তে তো আমার ভীষণ ভালো লাগে। নৌকার মৃদুমন্দ দুলুনি, পানির ছলাত ছলাত শব্দ, এই অনুভূতিগুলো অসাধারণ।

অপুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল সবচেয়ে বেশি। অপু সাইটেড। আমার সহপাঠী। ও কথা বলে ভালো, ডিবেট করে ভালো। আমিও ভালো বিতর্ক করতে পারতাম। ডিবেট করে অনেক পুরস্কারও পাইছি। বিতর্ক অনুষ্ঠানের শেষে স্যাররা আমার খুব প্রশংসাও করতেন। আমি কবিতাও আবৃত্তি করতে পারি। ক্যাসেটে শুনে শুনে কত কবিতা যে মুখস্থ করছি। আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, তারপর বিদ্রোহী, বল বীর চির উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারই নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির...সুকান্ত ওই সময় আমার খুব প্রিয় কবি ছিল। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে তার কাছে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক, নতুন বিশ্বের দ্বারে ব্যক্ত করে অধিকার, জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে...

আমার সহপাঠী মুনিরের বাড়িতে যেতাম। ওর মা আমাকে খুব আদর করতেন। ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াতেন। তারপর আমরা আড্ডায় বসতাম। ওর ছোট বোন ময়নাও এসে যোগ দিত সেই আড্ডায়। ময়না আমাদের তিন ক্লাস নিচে পড়ে। ময়না যোগ দেওয়ায় আড্ডায় নতুন আকর্ষণ যুক্ত হয়।

এরপরে রোজ যেতে শুরু করি ওদের বাসায়। ময়নার সঙ্গে দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কথা না বললে ভালোই লাগত না। কী যে সেই টান বুঝি না। শুধু ক্লাস শেষ হলেই মন বলত, চল, ময়নাদের বাড়ি।

রোজ যাই ওদের বাসায়। খাওয়াদাওয়া করি। গল্প করি ময়নার সাথে।

আমি আসলে কথা বলতে পারি ভালো। আর চোখে সানগ্লাসটা দেওয়া থাকলে কেউ বুঝতেও পারবে না আমার কোনো অসম্পূর্ণতা আছে। আমি যে চোখে দেখি না, সেটা তো আমার সমস্যা। আমার সঙ্গে যে কথা বলতেছে, তার সমস্যা নয়। ফলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ময়নার সঙ্গে যে কত গল্প করতাম। সবকিছু নিয়ে গল্প হতো।

অন্য বন্ধুরা খেপাত আমাকে। কী রে, শ্বশুরবাড়ি থেকে আসলি। কথাটা মুনিরেরও কানে গেছে। মুনির গায়ে মাখে নাই। আমি মুনিরকে বললাম, দোস্তো, তুই কিন্তু মানুষের কথায় কান দিবি না। আন্দাজে কোনো কিছু ভাববি না। তোর যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকে, তুই আমাকে বলবি সরাসরি।

মুনির আমাকে বিশ্বাস করছিল।

আমিও সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখছি।

ময়না একদিন একলা পেয়ে আমাকে বলে, আজাদ ভাই, আপনাকে কিন্তু আমি ভাইয়ের চোখে দেখি না। অন্য চোখে দেখি।

শুনে আমার মনটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে ওঠে। আমিও যে মনে মনে ওকে অনেক পছন্দ করে ফেলি নাই, তা তো নয়। আমি বলি, কী চোখে দেখো।

সে বলে, আপনি বোঝেন না?

আমি বলি, না বুঝি না।

ওর মুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছা করতেছিল। ও বলুক আমি আপনাকে ভালোবাসি।

ও বলে, এইসব কথা মুখে বলতে হয় না। বুঝে নিতে হয়।

আমি বলি, আমি তো তোমার লেখা পড়তে পারব না, না হলে বলতাম লিখে দাও। আচ্ছা মুখেই বলো।

ও বলে, আমি আপনাকে...

বলো

আমি আপনাকে...

বলো...

আমি আপনাকে ভা...

বলো
আমি আপনাকে ভালো...না আর বলব না। ময়না ঘর ছেড়ে উঠে চলে যায়।
আহ্। কী মধুক্ষরা এই বাক্য। মনে হয়, আকাশ-বাতাস সব রুমঝুম করে বাজতেছে। মনে হয় শান্তির বর্ষণ শেষে আকাশে উঠল সাতরঙা রংধনু। মনে হয়, এক লক্ষ বেলিফুল ফুটে উঠল তিতাস নদীর চরে চরে। মনে হয়, বউ কথা কও বলে এক শ একটা হলুদবরণ পাখি ডাক পাড়তেছে আমারই উঠানে! কী যে ভালো লাগতেছে। কী যে ভালো...ভাত গলা দিয়া নামে না, বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, ব্রেইলওয়ালা বই সামনে রেখে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর খেয়াল হয় কিছুই পড়া হয় নাই...
কিন্তু তার পরের দিন যখন আবার যাই ওদের বাসায়, আমি এমন ভাব করি যেন ও গতকাল আমাকে কিছুই বলে নাই।
আর যা বলেছে, সে কথারও কিছুই আমি বুঝি নাই।
না, আমি উসকে দেই নাই ময়নাকে।
আমি মুনিরকে কথা দিছলাম।
কিছু একটা বলে ফেলে ময়নার সঙ্গে গল্প করার, দেখা করার, অনেক ঘণ্টা-মিনিট ওর কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনাটাকে তো আমি উড়ায়া দিতে পারি না।
ওই সময় মান্না দের একটা গান খুব ভালো লাগত: জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই, পাছে ভালোবেসে ফ্যালো তাই দূরে দূরে রই।
ময়নার মা-ভাই আমাকে পছন্দ করলেও ময়নার বাবা, আমার কেন জানি মনে হয়, আমাকে পছন্দ করতেন না! আমি তো তার চোখমুখ দেখি নাই, কিন্তু কথা শুনলেও তো বোঝা যায়, লোকটা আমাকে ঠিক মেনে নিতে পারতেছে না। আমিও ময়নার বাবাকে এড়ায়া চলতাম।
আর তা ছাড়া আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হোস্টেলের জঘন্য খাওয়ার কবল থেকে বাঁচার জন্যেও তো আমাকে মুনিরের আম্মার রান্নার স্বাদ নিতে বাধ্য হতে হইত। আন্টির রান্নার হাত সত্যি ভালো ছিল।

১৭.
সামনে এসএসসি পরীক্ষা।
আমি নারায়ণগঞ্জের বাসায় বসে দিনরাত পড়ি।
ব্রেইলে নেওয়া নোট পড়ি। ক্যাসেট প্লেয়ারে রেকর্ড করে নেওয়া প্রশ্নের উত্তর শুনি। বড়পা, রুজি-রাও আমাকে বই পড়ে পড়ে শোনায়।
একদিন গভীর রাতে আমি পড়তেছি।
বাসার সবাই ঘুমায়া পড়ছে, কিন্তু আমি ঘুমাই নাই। আমি পড়তেছি।
আমার পানির পিপাসা লাগছে। একা একা ডাইনিংয়ে গিয়া পানি খাই। শীতকাল, তারও পর মশা। আমার পায়ে মোজা, তাতে শীত ও মশা দুইয়ের হাত থেকেই খানিকটা রক্ষা পাওয়া যায়।
ফলে আমি যে ডাইনিংয়ে গেছি, কেউ টের পাইতেছে না।
ডাইনিংয়ের এক পাশে আমাদের বাইরের ঘর।
আজকে বাইরের ঘরে এক নববিবাহিত দম্পতি এসে উঠছেন।
সম্পর্কে আমার মামা হন। নিজের মামা না, শাখায় প্রশাখায় মামা।
রাত দুইটারও বেশি বাজে।
এত নিঝুম চারদিক যে মনে হয় নিজের নিশ্বাসের শব্দও পাওয়া যাবে।
আর আমার কান হলো খরগোসের কানের চেয়েও সজাগ। কারণ কান দিয়েই আমি দেখি। কান দিয়েই আমি চলি।
আমার কানের এন্টিনায় ধরা পড়ে, বাইরের ঘরে নববিবাহিত দম্পতি নড়াচড়া করতেছে।
বাইরের ঘর আর ডাইনিংয়ের ফাঁকে একটা জানালা।
আমি জানালার কাছে গিয়া নীরবে দাঁড়াই।
এই, ঘুমাইছ, পুরুষ কণ্ঠ বলে।
হুঁ।
আরে কত ঘুমাইবা।

একবার না করলা, এখন জ্বালাইও না তো। ঘুমাই।
আরে ঘুমাইবাই তো। আসো আমার বুকে ঘুমাও।
নড়াচড়া। বোঝা যাচ্ছে, পুরুষটা নারীটাকে বুকে টেনে নেয়।
তারপর চুমুর শব্দ।
এই কী করো?
কেন?
এখন আর কাপড় খুইলো না। ঠাণ্ডা লাগে।
আরে লেপ তো আছে।
ছোট লেপ। গায়ে থাকে না।
আচ্ছা ঠাণ্ডা লাগবে না। আমি তোমারে গরম করতেছি।
পুরুষটা কী প্রক্রিয়ায় জানি না, মহিলাকে গরম করে।
তারপর...শব্দ শব্দ, তারপর বিছানার আর্তনাদ, তারপর গোঙানি, শ্বাস, আহ্ উহ্...
আমার নিজের শ্বাসও আমি এখন শুনতে পাই।
আমার শরীরের মধ্যেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।
পুরাটা সময় আমি কানে কানে তাদের পুরোটা ভালোবাসার উত্তাপ গোপনে নীরবে চুপি চুপি চুরি করে নিয়ে এই শীতের কাতর রাতে খানিকটা উষ্ণ হয়ে উঠি।

আমার আর স্বপনের একজন করে রাইটার দরকার। তাদেরকে হতে হবে ক্লাস এইটের ছাত্র। যখন পরীক্ষা শুরু হবে তখন অবশ্য তারা নাইনে উঠে যাবে। পরীক্ষা হবে মার্চ মাসে, মাত্র দুই মাস ক্লাস নাইনে পড়ে তারা এসএসসির পাঠ বিষয়ে কীই-বা জানবে।
আমরা আর্টসের ছাত্র। ক্লাস টেনে পড়ি।
আমাদের স্কুলের ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করি ওই স্কুলের ক্লাস এইটে।
আমি আর স্বপন।
স্যার বলেন, এরা দুইজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের ছাত্র।
এরা সামনে এসএসসি পরীক্ষা দিবে। এরা ব্লাইন্ড। ওরা নিজেরা খাতায় লিখতে পারবে না। ওদের রাইটার দরকার। পরীক্ষার হলে কোশ্চেনপেপার পেলে সেটা ওদের পড়ে শোনাতে হবে। ওরা উত্তর বলবে। রাইটার সেটা লিখবে। রোল এক থেকে দশের মধ্যে দুইজন দরকার। তোমরা কে কে এদের রাইটার হতে রাজি আছ হাত তোলো।
দুইজন ছাত্রকে পাওয়া যায়। সজীব ক্লাসের সেকেন্ড বয়। ও হবে আমার রাইটার। আর তপনের রোল ৩, ও হবে স্বপনের রাইটার।
ওরা আমাদের স্কুলে আসে। আমাদের স্যারের কাছে ওদের নিয়ে যাই। স্যার ওদের বলেন, তোমাদের ছবি লাগবে, আর তোমাদের গার্জিয়ানের পারমিশন লাগবে। এই ফরমটায় তোমাদের আব্বার সাইন নিয়া আসবা।
সজীবের বাবা ছিলেন কলেজের শিক্ষক। খুব ভালো ফ্যামিলি ওদের। ওর বাবা ওকে বলেন, বাবা খুব ভালো কাজ করছ। ভালোভাবে পরীক্ষা দিবা।

পরীক্ষার সময় এসে যায়। সজীবের হাতের লেখা ছিল কম্পিউটারের মতো। খুব সুন্দর। কিন্তু ওর একটা সমস্যা ছিল, ও লিখত খুবই ধীরগতিতে। খুবই স্লো। সেটা তো আমি আগে জানতাম না। এমনিতেই রাইটার নিয়ে লেখার সমস্যা আছে। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৫/১০ নম্বর ছেড়ে আসতে হয়। আর সজীবের কারণে সেইটা অবধারিত হয়ে গেল।
যা-ই হোক, পরীক্ষা দিতে থাকি। পরীক্ষার সিট পড়ছিল সাবেরা সোবহান হাইস্কুলে। এই স্কুলে ময়না পড়ত। মুনিরও তো আমাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে। তাই রোজ ময়না এসে পরীক্ষার হলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, পরীক্ষা কেমন হইছে? আমি বলি, ভালো। পরীক্ষা আবার আমি কখনোই খারাপ দেই নাই।
ও বলে, আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আপনার জন্যে দোয়া করি। ও তো ছোট ছিল। ক্লাস এইটে পড়ে। হুজুরবাড়ির মেয়ে। ও কী-বা এমন বোঝে। তবে মেয়ে হিসাবে এক ধরনের ম্যাচুরিটি আছে তার ভেতরে, যেটা সাধারণত ছেলেদের থাকে না।

পরীক্ষা শেষ হলে আব্বার পাঠানো টাকা দিয়ে সজীবকে ক্যালকুলেটর, জামাকাপড় এইসব কিনে দেই। সজীব খুব খুশি হয়।
এইবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছেড়ে চলে আসবার পালা।
ময়নাদের বাড়ি যাই। ময়নার মার কাছ থেকে বিদায় নেই। ময়নার বাবা বাসায় থাকায় বেশি সুবিধা করতে পারি না। ময়না আসে। বলি, ময়না, পরীক্ষা তো শেষ। এবার যাই।
ময়না বলে, যাই বলে না। বলেন আসি।
আমি বলি, আমি আবার আসব। স্কুলে তো অনেকবার আসতে হবেই। মার্কসশিট নিতে, সার্টিফিকেট নিতে।
অন্য কোনো কারণে আসবেন না? শুধু স্কুলের কাজে আসবেন?
আসব।
আমি চলে আসতেছি। ময়না কি আমার পথের দিকে তাকায়া আছে?
ময়নার চোখে কি জল?
আমি সেটা কোনো দিনও দেখতে পাব না।
মুনিরের হাত ধরে আমি বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে থাকি।

১৮.
এসএসসি পরীক্ষার পরে নারায়ণগঞ্জে আদমজীর বাড়িতে ফিরে আসি।
আব্বা এরই মধ্যে আদমজী মিল এলাকার ভেতরেই, কীভাবে কীভাবে যেন, একটা বাড়ি কিনে ফেলছেন। আমরা সেই বাড়িতে থাকি।
রত্না পড়ে ক্লাস এইটে, ঢাকায় ব্যাপ্টিস্ট স্কুলের হোস্টেলে থাকে। রুজি পড়ে ক্লাস সেভেনে। আদমজী গার্লস হাইস্কুলে। আর আমার ভাগ্নি জেসমিন পড়ে ক্লাস ফাইভে।
আমি আব্বাকে বলি, আব্বা আমাকে একটা ব্রেইল টাইপ রাইটার কিনে দেন।
আব্বা বলেন, কোথায় পাওয়া যায়।
বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকে আনান লাগে।
আচ্ছা, আমি এবিসি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়া আসব কীভাবে এই টাইপ মেশিনটা আনাইতে হয়।
প্রায় তিরিশ হাজার টাকা দিয়া বিদেশ থেকে একটা ব্রেইল টাইপ মেশিন কিনে আনানো হয় আমার জন্যে।
আমি দিনরাত লেগে থাকি সেই টাইপ রাইটার নিয়া। এ এক নতুন জগৎ।
খুব শিগগিরই টাইপিংয়ে দারুণ স্পিড অর্জন করে ফেলি।

আমার স্বপ্ন, আমি নটর ডেম কলেজে ভর্তি হব।
সবই নির্ভর করছে এসএসসির রেজাল্টের ওপর। কারণ পরীক্ষা তো আমি দেই নাই। আমি শুধু বলে গেছি, লিখছে সজীব, কেমন যে লিখছে, আদৌ লিখছে তো!
রেজাল্টের দিন আমি নারায়ণগঞ্জে। যার যার স্কুলে এবার রেজাল্ট চলে যাবে।
একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকানে গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফোন করি সজীবদের বাসায়। সজীব বাসায় ছিল না। ও খুব ভালো ক্রিকেট খেলত, কাজেই ওই সময় সে মাঠে।
ওর বাবা ফোন ধরেন।
আমি বলি, আংকেল, আমি আজাদ। আমার রেজাল্টটা কি কেউ দেখছে?
না তো। আমি তো জানি না। আংকেল বলেন।
সজীবকে একটু বলেন-না, আমার রেজাল্টটা দেখে আসতে।
ও তো বাবা বাসায় নাই, ক্রিকেট খেলছে বোধ হয়। আচ্ছা আমিই দেখে আসছি। তুমি ১০ মিনিট পরে ফোন করো। সজীবের বাবা বলেন।
কিছুক্ষণ পরে আবার ফোন করব। সেই কিছুক্ষণ আমার কাছে মনে হইতে থাকে কত যুগ। সমস্ত শরীর কেমন করছে, পেটের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বারবার উঠতেছি। বারবার বসতেছি। পানি খাইতেছি। হাঁটতেছি। অবশেষে ফোন করি। সজীবের বাবা ধরেন। হ্যালো...
আংকেল... আমার গলা দিয়া স্বর বারাইতে চায় না। আমি মিনমিন করে বলি, আমি আজাদ, রেজাল্টটা কি...

বাবা, এইবার তো তোমাদের স্কুল খুব খারাপ করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুল থেকে দুইজন মাত্র ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে, সেই দুইজন হলো তুমি আর সৃপন।

আমার ঘাম দিয়ে জ্বর সারে।

রেজাল্ট শুনে ছুটে যাই আব্বার মাংসের দোকানে। আব্বাকে জানাই আমার রেজাল্ট।

আব্বা খুব খুশি।

বাসায় যাই । বাসায় খুশির রোল পড়ে যায়।

আব্বা অনেক মিষ্টি কিনে নিয়া হাজির।

আব্বা বলেন, তুমি কবে যাবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আমি বলি, কালকেই।

পরের দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসে উঠে বসি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেমে মিষ্টি কিনি ১৪ কেজি। প্রথমে যাই আছমাতুন্নেসা ব্লাইন্ড হোস্টেলে।

হোস্টেলের সব ছেলেদেরকে মিষ্টি খাওয়াই। স্যারদের খাওয়াই।

তারপর যাই মুনিরদের বাসায়। অনেক মিষ্টি নিয়া।

ময়না দৌড়ে আসে। আজাদ ভাই, আমি খুব খুশি হইছি। আল্লা আমার দোয়া কবুল করছে। আপনি তাই ভালো রেজাল্ট করছেন।

আমি বলি, তা-ই হবে ময়না। তুমি দোয়া করছিলা বলেই ফার্স্ট ডিভিশনটা পাইছি।

পাশে থেকে উঁকি দেয় মুনির, হঠাৎই, বলে, তুই দোয়া কইরাই যদি ফার্স্ট ডিভিশন দেওয়াইতে পারস, আমার লাইগাই দোয়া করলি না ক্যান?

ময়না লজ্জা পেয়ে অন্তঃপুরে চলে যায়।

তারপর ভর্তিযুদ্ধ। আব্বা ঘোষণা করেন, টাকা কোনো ব্যাপার না। যত টাকা লাগুক লাগবে। তুমি যেখানে ভর্তি হইতে চাও হবা।

আমার স্বপ্ন নটর ডেমে ভর্তি হব। স্কুল থেকেই এই কলেজের নামডাক শুনে আসতেছি। কিন্তু ভর্তি হইতে চাইলেই কি হওয়া যাবে। অনেকেই তো ভর্তি হইতে চায়। কয়জন হইতে পারে।

নটর ডেম কলেজে যাই। প্রিন্সিপ্যাল স্যারের সঙ্গে দেখা করি। ওনারা ব্লাইন্ডদের ব্যাপারটা আগে থেকেই জানেন। এর আগেও ভর্তি করাইছেন ব্লাইন্ডদেরকে। কাজেই অসুবিধা হয় না। ফরম তুলি। ফিলআপ করে জমা দেই। এবারও আমার রাইটার সেই সজীবই। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তাকে আনান হয়। এমসিকিউ, রচনা–দুই ধরনের প্রশ্নই আসে। পরীক্ষা ভালোই হয় (আমার পরীক্ষা কখনো খারাপ হয় না, মানে আমি বলি না যে পরীক্ষা খারাপ হইছে)।

তারপর রেজাল্ট। পরীক্ষার হলেই জানায়া দেওয়া হয়, সাত দিন পরে রেজাল্ট বার হবে জনকণ্ঠ পত্রিকায়। সাতটা দিন উৎকণ্ঠা নিয়ে কেটে যায়।

রেজাল্টের দিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই রুজিকে পাঠায়া দেই পত্রিকা কিনতে।

পরীক্ষায় আমি ভালোই করছিলাম।

২০০ নম্বরের মধ্যে ১৭৫ পাইছিলাম।

এরপরে ভাইভা। ভাইভা বোর্ডে ছিলেন রুবি এমেলদা গোমেজ। ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাসা কোথায়। কয় ভাইবোন। আব্বা কী করেন। নটর ডেমের পড়ার খরচ কিন্তু বেশি। তোমার ফাদার সেটা এফোরড পারবেন তো। আমি বলি, হ্যাঁ। পারব। ব্যস, নটর ডেমে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আসলে ভাইভাটা কিছু না। খালি দেখে, ছেলেটার বেশভূষা চালচলন ভদ্রগোছের কি না, কানে দুল, হাতে বালা, মাথায় বেনি আছে কি না!

সৃপনও চান্স পাইছিল নটর ডেমে। কিন্তু পড়ে নাই। আসলে ওর ফ্যামিলির অর্থনৈতিক অবস্থা এত ভালো ছিল না। ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই ফিরে যায়। ওখানেই ইন্টারমেডিয়েট পড়বে।

১৯.

নটর ডেম কলেজে ক্লাস শুরুর আগে নতুন ব্যাচের ছেলেদের নিয়া অনুষ্ঠিত হয় একটা পরিচিতি সভা। মাঠে শামিয়ানার নিচে অনুষ্ঠিত এই সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করায়া দেওয়া হয়। প্রিন্সিপাল স্যার বলেন, শোনো, আমরা তোমাদেরকে এই কলেজে ভর্তি করিয়েছি, তোমরা বেশি নম্বর পেয়ে ইন্টারমেডিয়েট পাস করবে, এই জন্যে নয়, বেশি নম্বর পাওয়া আমাদের কলেজের লেখাপড়ার লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য

হলো তোমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি করা, তোমাদের ভেতরে যার যা গুণ আছে, সেটাকে উসকে দেওয়া, তোমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার পথ দেখানো। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখানো হয় বিভিন্ন ক্লাস। সহপাঠীদের একজন আমাকে বলে, তুমি আমার হাত ধরো। আমি তার হাত ধরে হাঁটতে থাকি। দোতলা, নিচতলা, বিভিন্ন ক্লাস, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, কমনরুম–ঘুরে ঘুরে দেখি(?) সব। এই দেখাতেও কিন্তু আমার কাজ হয়। আমি ঠাউরে নিতে থাকি কোথায় কোন ঘর। কয়টা সিঁড়ি ভাঙতে হবে একেকটা তলায় যেতে।

পরের দিন থেকে ক্লাস।

প্রথম ক্লাস ছিল ইংরাজির। নিয়েছিলেন একজন শিক্ষিকা। তার কণ্ঠস্বর চমৎকার। প্রথম পড়া তেমন হয় নাই, তিনি নটর ডেমের বিভিন্ন নিয়মকানুন সম্পর্কে বলেন। পরের দিন থেকে শুরু হয়ে যায় পড়াশোনা।

ইংরাজি ক্লাস একেকজন একেক দিন নেন। কেউ হয়তো পড়াচ্ছেন মাদার ইন ম্যানভিল তো আরেকজন পড়াচ্ছেন লাঞ্চিয়ন। শিক্ষকদের মধ্যে ইংরেজ ব্রাদাররাও আছেন।

আমাকে রোজ সকালবেলা কলেজে নিয়ে আসেন আম্মা। খুব ভোরে উঠতে হয়। তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে তৈরি হয়ে নিয়া ঢাকার বাসে চড়ে আসতে হয় গুলিস্তান। সেখান থেকে রিকশায় বা বেবিট্যাক্সি করে নটর ডেম কলেজ।

পড়াশোনার ব্যাপারে তখন আমি ভীষণ সিরিয়াস। ব্রেইলে কোনো বই নাই, আমাকে সবগুলো বই ব্রেইলে টাইপ করে ফেলতে হবে। নোট তৈরি করতে হবে।

রোজ আমি বাসায় ফিরে এসে একটুখানি বিরতি দিয়েই শুরু করি লেখাপড়া। বড় আপা আমাকে বই থেকে পড়ে শোনান আর আমি শুনে শুনে টাইপ করি। ক্লাসে বসে নোটও নেই ব্রেইল পদ্ধতিতে। বাসায় ফিরে এসে আঙ্গুল বুলিয়ে সেই লেখা পড়ে সেটা থেকে টাইপ মেশিনে টাইপ করে নোট বানাই। পরিশ্রমও করতে পারতাম তখন! রাতের পর রাত জেগে নোট তৈরি করছি। পড়া মুখস্থ করছি।

দৃষ্টিমান ছেলেদের চেয়ে আমাদের পরিশ্রম দ্বিগুণ। তাদেরকে তো আর বই কপি করতে হইতেছে না। ইচ্ছা হইলে যেকোনো বই দেখে নিতে পারে তারা। ইচ্ছা হইলে একটা ডিকশনারি দেখে নিতে পারে।

কিন্তু আমি পারি না। বাংলাদেশে অন্ধদের জন্যে কোনো ডিকশনারি নাই। পাওয়া যায় না। বিদেশে আছে। দাম অনেক।

রোজ ভোরে আদমজী থেকে রওনা দেওয়া আর যানজট পার হইয়া ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার করে ফেলা। শরীরে আর কত কুলায়। আর আম্মারও জীবন বলতে কিছু ছিল না। আমাকে ক্লাসে ঢুকায়া দিয়া তিনি সারা দিন কী করবেন। খাবেন কোথায়। বসবেন কোথায়? বাথরুম সারবেন কোথায়? নামাজ পড়বেন কোথায়?

কাজেই আমাকে একটা মেসে উঠতে হয় ঢাকাতেই। শাহজাহানপুর কবরস্থানের কাছে ছিল সেই মেস। সেই মেসের সবই ভালো ছিল, শুধু খাওয়াটা ছিল জঘন্য। আমি আবার একটু খাদ্যরসিক ধরনের মানুষ।

দিন-রাত পরিশ্রম। প্রতি সপ্তাহে দুইটা করে ক্লাস-টেস্ট হয় নটর ডেমে। এখন আমি প্রতি সপ্তাহে দুইজন রাইটার পাব কোথায়? ক্লাস টেনে পড়া রাইটার লাগবে আমার। কখনো কখনো আম্মা ধরে ধরে আনতেন। নারায়ণগঞ্জ থেকেও। আমাদের নটর ডেম কলেজের ভেতরেই কতগুলো হাতের কাজের কর্মসূচি আছে, তাতে খ্রিষ্টান বা আদিবাসীরা বৃত্তিমূলক কাজ করে, কখনো কখনো সেখানে কর্মরত ছেলেদের আমি ধরে ধরে আনি রাইটার হিসাবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ভালো ছাত্র হিসাবে নটর ডেমেও ছড়ায়া পড়ল আমার নাম।

প্রতি সপ্তাহে দুইজন রাইটার জোগাড় করা, ব্রেইলের কাগজ কেনা, মেসের পয়সা–সব মিলায়া খরচ তো কম হইতেছিল না। তার ওপর আছে কলেজের মাসিক বেতন। সেটা কিন্তু কম না। আমি আর আম্মা একদিন যাই প্রিন্সিপ্যাল স্যারের কাছে, টিউশন ফি মওকুফ করানোর দরখাস্ত নিয়া, স্যার বলেন, নটর ডেম যে একটা ব্যয়বহুল কলেজ, ভর্তির আগে সেটা তোমাকে বলা হয় নাই?

জি স্যার বলা হয়েছিল।

কী বলেছিল?

এই যে আমরা খরচ অ্যাফোর্ড করতে পারব কি না?

কী বলেছিলে?

জি, পারব বলেছিলাম।

তাহলে। যাও। নটর ডেমে এইসব হবে না। স্যরি।

নটর ডেমের একটা দিনের কথা খুব মনে পড়ে। আমার রোল ছিল ৭৫। আর আমার যে বন্ধুটির রোল ছিল ৭৪, সে

ছিল খুবই ভালো একটা মানুষ। স্যার সেদিন বাংলার পরীক্ষার খাতা দিতেছিলেন। একটা একটা করে রোল ডাকা হইতেছে। স্যারের টেবিল আমার থেকে বেশ দূরে। রোল নম্বর ৭৪ আমার পাশেই বসা। নটর ডেমের নিয়ম ছিল রোল অনুযায়ী সব ছেলে একের পর এক বসত। এই কারণে স্যার/ম্যাডামদের রোল কল করতে হতো না। স্যাররা এসে ছাত্রদের উপস্থিতির খাতায় উপস্থিত বা অনুপস্থিত চিহ্ন দিতেন, ওই বেঞ্চের দিকে তাকিয়েই। কে অনুপস্থিত দেখলেই বুঝতেন। কাজেই ৭৪ ছিল আমারই পাশে। এখন আমার রোল ৭৫ ডাকার আগেই ওকে তো যেতে হবে। ওর রোল তো ৭৪। ও গিয়ে খাতা আনবে। তারপর আমার যাবার পালা। আমি যাব কেমন করে। অনেক দূরে স্যার। ৭৪ বলল, আজাদ, তোমার খাতাটা আমিই এনে দিই। আমি বললাম, তাহলে তো ভালোই হয়।

৭৪ নিজের খাতা নেবার পর যেই না গেছে আমার খাতা নিতে, অমনি স্যার ওর গালে ভীষণ জোরে একটা চড় মেরে বসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর নাক দিয়ে রক্ত বের হতে শুরু করে।

এই রকম কড়া ছিল নটর ডেমের ব্যবস্থা।

একবার হলো কী, বিজ্ঞানের গ্রুপ ৬-এর ছেলেরা গিয়ে প্যারেন্স নামে গাইডেন্স স্যারকে গিয়ে বলে, স্যার জিসি স্যারের ক্লাস ভালো লাগে না। ওনাকে বদলায়া দেন। গাইডেন্স স্যার তো ভীষণ কড়া। বলে দেন, না হবে না।

আমি একবার বলছিলাম, স্যার, আজকে একটা কালচারাল প্রগ্রাম আছে, আমার শরীরটা খারাপ লাগতেছে, আমি বাড়ি যাই! স্যার বলছিলেন, না হবে না। তুমি ব্লাইন্ড, না সাইটেড–এটা আমি দেখব না। আমি দেখব তুমি নটর ডেমের ছাত্র কি না।

তো বিজ্ঞানের গ্রুপ ৬-এর ক্লাসে আবার জিসি স্যার গেছেন। আর ছেলেরা বেঞ্চ চাপড়াতে শুরু করে দিছে। নিচে ওই গাইডেন্স স্যার শব্দ শুনে উপরে উঠে যান। গিয়ে ক্লাসে ঢুকে বলেন, বলো, কে বেঞ্চ-এ নক করেছে। কেউ তো স্বীকার করে না। কারও নামও বলে না। উনি সবাইকে আটকে রাখেন ক্লাসে। সারা সকাল। সারা দুপুর। সারা বিকাল। সারা সন্ধ্যা। অভিভাবকরা ফোন করতেছে। না। উনি ছাড়বেন না। বাথরুমেও যেতে দিবেন না। তালা দিয়ে রেখে চলে গেছেন। তখন ছেলেরা বাধ্য হয়ে জানালা দিয়ে পেশাব পর্যন্ত করছে।

তারপর নিচে নামায়া ছেলেদের লাইন ধরে দাঁড় করায়ে রাখা হইছিল। অভিভাবকদের ফোন করে ডেকে এনে সাইন করায়া নিয়ে তারপর ছেলেদের উনি ছাড়ছেন।

২০.

আজাদ, আজাদ।

বড় আপার জা, আমি যাকে আপু বলে ডাকি, যার বাসায় আমি আর মা আর বিল্লাল এসে উঠছি ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষাটা দেবার জন্যে রাত্রিযাপন করতে, প্রায় দিন পনেরোর অতিথি হয়ে, তিনি ডাকছেন। বলা বাহুল্য, এই বাসায় আসার সময় আব্বা প্রচুর পরিমাণ বাজার-সদাই করে সঙ্গে দিয়া দিছেন, যাতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর চিত্তজয় সহজ হয় এবং তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক বসবাসের অসুবিধা-সৃষ্টি-জনিত আমাদের অপরাধ খানিকটা লাঘব হয়।

আমি তখন মন দিয়ে পড়তেছি। আমার ব্রেইল পদ্ধতিতে তৈরি করা নোটের মধ্যে ঘাড় গুঁজে দিয়া।

আজাদ আজাদ। আপুর কণ্ঠ।

আমি চমকে উঠি। জি আপু।

দ্যাখো কারা আসছে।

কারা আপু। আমি আপুর কণ্ঠস্বরের দিকে মুখ ঘুরায়া বলি।

উনি বলেন, এরা দুই যমজ বোন। পড়ে ভিকারুননিসায়। ওরাও তোমার সঙ্গে পরীক্ষা দিচ্ছে।

আচ্ছা আচ্ছা। আমি পড়ার সমুদ্র থেকে গাত্রোত্থান করলাম।

আপু আরও বলেন, তুমি নটর ডেমের ছাত্র শুনে ওরা ইন্টারেস্ট ফিল করতেছে। তোমাদের সাজেশন আর ওদের সাজেশন মিলায়া পড়ো। দুইয়েরই লাভ হতে পারে।

আমি বলি, আসেন। বসেন। আপনাদের কার কী নাম?

আমার নাম শিমুল।

আমার নাম বকুল।

আচ্ছা, আচ্ছা, আমার নাম আজাদ।

আচ্ছা, ভূগোলে আপনাদের সাজেশন কী কী বলেন তো। এইটা শিমুলের গলা। আমি কণ্ঠস্বর শনাক্ত করার খেলা খেলি।

ভূগোলে? এইবার ইম্পর্ট্যান্ট হলো...আমি বকতে শুরু করি।
সেই শুরু।
ওরা মাঝেমধ্যেই আসে । আর আমিও ওদের মুগ্ধ করবার জন্যে আমার বিদ্যা ঝেড়ে দিতে থাকি।
ওরাও ইমপ্রেসড।
ভূগোল পরীক্ষার পর দেখা যায়, সত্যি আমার সাজেশনগুলা থেকেই বেশি কোশ্চেন কমন পড়ছে।
আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । সেই বন্ধুত্ব আজও আছে।
পরীক্ষার জন্যে ওই বাসায় থাকার সময় আরেক অভিজ্ঞতা হয়। ওই বাসার কর্তা, আমি যাকে ডাকি দুলাভাই বলে, উনি আমাকে রাত জেগে পড়তে দেবেন না। খালি বলেন, ঘুমাও। খুব জোর করতেন ঘুমানোর জন্যে। আমি কি আর ঘুমাই। আমি বলি, আর এক ঘণ্টা! আর এক ঘণ্টা! এই করে করে রাত কাবার করে দিতাম। পরীক্ষার রাতে আমি কখনো ঘুমাই না।
দুলাভাইয়ের অসুবিধা কী? উনি ছিলেন এক ভণ্ড পীরের মুরিদ। সেই পীর নাকি বলছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দরকার নাই, খালি রাতে নফল নামাজ পড়লেই হবে। তবু তার ছবি পাশে রাইখা। চিন্তা করেন কী রকম ভণ্ড! রাতে দুলাভাই আতর-টাতর লাগায়া বড় পানের ডিব্বা ভরা পান নিয়া কাফনের কাপড়ের মতো এক খণ্ড শাদা কাপড় গায়ে জড়ায়া নামাজ পড়তেন। সারা রাত। ওয়াক্তিয়া নামাজের দিকে খেয়াল নাই।
আমি আর আমার রাইটার বিল্লাল তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিতাম। ওনার শেলফে আবার অনেক বই। মাদারেসে গাজ্জালি নানা বই। এইসব পড়ছে। পড়তে পড়তে মাথা-খারাপ করে ফেলছে।
পরীক্ষা দিয়া ফিরলেই আপা এক গেলাস বেলের শরবত খাওয়াইতেন।

পরীক্ষা শেষ হইল।
সেইদিনেই আমরা গাট্টিবোচকা বেঁধে টেম্পোতে চড়ে নারায়ণগঞ্জ চলে আসলাম। আমি আর আমার রাইটার। পরে বিল্লাল চলে গেল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ওর বড় ভাই ওকে ভীষণ বকাবকি করলেন। মারধর করারও চেষ্টা করছিলেন। ওর বাবা-মা ঠেকায়া রাখছে কোনোমতে।

২১.

ইন্টারমেডিয়েটের রেজাল্ট বারাইছে।
রেজাল্ট দেখতে যাই। আশা ছিল, স্টার মার্কস পাব। পাই নাই। ফার্স্ট ডিভিশন পাইছি। আমি বেশি খুশি হইতে পারলাম না। তবে আব্বা অনেক খুশি হইছিলেন। উনি আবার মিষ্টিটিষ্টি খাওয়াইলেন সবাইকে।
মার্কসশিট আসে কলেজে। গিয়া আনি। ৬৯৬ পাইছি। হইছে আর কী! চলে!
তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। আমি এসে উঠি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সোহেলের রুমে, সূর্যসেন হলে।
উনিই আমার ফরম-টরম ফিলআপ করার সময় সহযোগিতা করছিলেন।
পরীক্ষার দিন সকাল সকাল উঠছি। নাশতা করতে গেছি ক্যান্টিনে। ফেরার সময় আপন মনে ফিরতেছি।
সূর্যসেন হলের নিচতলার বারান্দা দিয়ে হাঁটতেছি। হঠাৎ দেখি, আমি নাই। ধরাম করে পড়ে গেছি উঁচু বারান্দা থেকে মাটিতে।
ব্যথাও পাইছিলাম। সমস্ত দুনিয়া চক্কর খাইতে থাকে। মনে হয়, এ এক অশুভ সংকেত। আমার আর পরীক্ষায় ভালো করা হবে না।
তখন মনে পড়ে আম্মার কথা। আম্মা প্রায়ই বলতেন, ছোটখাটো দুর্ঘটনা অনেক সময় বড় বিপদকে দূর করতে সহায়তা করে।
যা-ই হোক, নয়টায় পরীক্ষা শুরু হইল। এবারও রাইটার বিল্লাল আমার পাশে। বিল্লাল এরই মধ্যে নটর ডেম কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হইছে। ওর ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে।
বিল্লাল আমার পাশে। বিল্লাল বিড়বিড় করে প্রশ্ন বলে। আমি তাকে সেই প্রশ্নের উত্তর বলি। সে লেখে।
প্রথম প্রশ্ন ছিল, বাংলা সন কোন সম্রাট প্রবর্তন করেন? ক) সম্রাট আকবর, খ) জাহাঙ্গীর, গ) শেরশাহ।
সম্রাট আকবর।
এরপর একটার পর একটা প্রশ্ন ও পড়ে। আমি দেখি, বেশির ভাগই আমি পারি।

আমাদের সঙ্গে কিন্তু সোহেলও অ্যাডমিশন টেস্ট দিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাস করে এসে সে এখানে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে।

পরীক্ষা ভালো দিলাম। খুব খুশি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্টের দিন আমি ছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সোহেল ভাইকে মোবাইলে ফোন দিলাম।

ভয়ে ভয়ে বলি, সোহেল ভাই, রেজাল্ট কী?

সোহেল ভাই বলেন, তুমি ভালো করছ। তোমার সিরিয়াল হইছে ১০৩। স্বপন অত ভালো করে নাই। ওর সিরিয়াল ৪০০-র পরে পড়ছে। তুমি যে সাবজেক্ট চাইবা সেইটাই মনে হয় পাইবা। স্বপন হয়তো সেকেন্ড চয়েসটা পাবে।

যাক। আজকে আমার আরেকটা স্বপ্ন পূরণ হলো।

ময়নার বাড়ি যাই। ময়নাকে খবরটা দেই। ও খুব নির্বিকার স্বরে বলে, আপনার রেজাল্ট তো ভালো হবেই। আমি রোজ নামাজ পড়ে এখনো আপনার জন্যে দোয়া করি তো!

বিল্লালের বাড়িতে অনেক মিষ্টি নিয়ে হাজির হই।

বিল্লালের ভাইজানকে ডেকে পায়ে হাত ধরে সালাম করে বলি, আপনার সহযোগিতা পেয়ে আজকে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করতে পারছি। আপনি আমাকে দোয়া করবেন, যাতে আরও ভালো করতে পারি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মৌখিক পরীক্ষার দিন জিজ্ঞাসা করে, কী সাবজেক্ট চাও।

আমার যেকোনো সাবজেক্ট পাবার মতো রেজাল্ট ছিল। আমি বলি, সমাজবিজ্ঞান চাই। দিয়ে দেয় সমাজবিজ্ঞান। ভর্তি হয়ে যাই।

বাসায় গিয়ে আব্বাকে বলি, আব্বা, যে সাবজেক্ট চাইছি। সেই সাবজেক্টই দিছে।

কোনটা লইছ? আব্বা বলেন।

আমি বলি, সমাজবিজ্ঞান।

আব্বা খেপে যান, তাইলে আর কী হইল। সমাজবিজ্ঞান কোনো বিষয় হইল? আরে, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই যদি পড়বি, তাইলে পড় ইংরাজিতে।

বড় আপা আর রুজি–ওদেরও মন খারাপ।

সমাজবিজ্ঞান, এই সাবজেক্টের জন্যে আমরা এত পরিশ্রম করলাম!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবে। সূর্যসেন হলে সোহেল ভাইয়ের রুমেই এসে উঠি। আমার বাল্যবন্ধু স্বপনও এসে ওঠে এই রুমেই। ও ভর্তি হইছে আইন বিভাগে।

আব্বা আর বড় আপার কথামতো সাবজেক্ট বদল করার জন্যে মাইগ্রেশন ফরম পূরণ করে জমা দেই।

আর আমার জন্যে হল বরাদ্দ হয় জসিম উদ্দিন। কিন্তু আমি জানি ব্লাইন্ডদের সুবিধা মুহসিন হলে। ওখানে অনেকেই আছে আমার পরিচিত। স্যার বলেন, হল বদল করতে হলেও অ্যাপ্লাই করতে হবে। তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করি। সেই দরখাস্ত নিয়ে ছুটে যাই ডিনের অফিস, প্রোভিসির অফিস, প্রোক্টরের অফিস। অনেক ছোটাছুটির শেষে পাই মুহসিন হল।

তবে প্রথম ক্লাসটা করছিলাম সমাজবিজ্ঞান বিভাগেই। আমি একা একা ডিপার্টমেন্টের বারান্দা দিয়ে হাঁটছি। কাকে জিজ্ঞাসা করা যায় ক্লাস হবে কোন ঘরে? একটা আপার কণ্ঠস্বর পছন্দ হলো। তাকে বললাম, আচ্ছা আপু, রুম নাম্বার ৩ হাজার ১৭টা কোন দিকে?।

উনি বলেন, আচ্ছা আপনি আমার ব্যাগটা ধরেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমার খুব অভিমান হয়। আমাকে ব্যাগ ধরতে হবে কেন। উনি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারতেন না?

আমি বলি, ঠিক আছে লাগবে না।

উনি বলেন, আমি কি আপনাকে হার্ট করলাম?

আমি বলি, না।

আমি কি আপনার হাত ধরে নিয়ে যাব?

না। লাগবে না–বলে আমি আরেক দিকে হাঁটতে শুরু করি। একটা বাড়িও খাই দেয়ালের সঙ্গে। তখন একটা ছেলেকণ্ঠ বলে, ভাইয়া আপনি কোথায় যাবেন। তাকে বলি। উনি হাত ধরে নিয়ে যান ৩০১৭-তে।

সকাল ১০টার দিকে মশিউর রহমান স্যার প্রথম ক্লাসটা নেন।

বেশ কয়েকটা ক্লাস হয়।
একটা জিনিস আমার খুব অবাক লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনেক জ্ঞানী। অনেক তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি নাম-যশ। কিন্তু আমাদের স্কুল বা কলেজের শিক্ষকদের তুলনায় একটা ব্যাপারে তারা আশ্চর্য রকম কম সচেতন। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে তাদের কোনো সচেতনতা নাই। ক্লাসে যে একজন ব্লাইন্ড ছেলে আছে, তাহলে বোর্ডে কোনো কিছু লিখে দিলে সেটা যে উচ্চারণ করে বলতে হবে, সেটা তারা কখনো মনে রাখেন না। মনে রাখাকে কর্তব্য বলে মনেও করেন না। তারা কেউ এসে একটু খোঁজখবর নেন না ব্লাইন্ড ছেলেদের। এটা কিন্তু নটর ডেমে বা স্কুলে হয়নি। ওখানে স্যাররা আমাদের কাছে আসতেন। আমাদেরকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করতেন বুঝছি কি না। আর একটা সমস্যা। স্যাররা লেকচার ক্যাসেট প্লেয়ারে রেকর্ড করতে দেন না। তাহলে আমরা নোট নেব কীভাবে। ব্রেইলের যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্লাসে যাব নাকি?
এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ইংরাজি বিভাগে বদলির আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়। ইংরাজি বিভাগের অফিসে যাই। দেখা হয় ডিপার্টমেন্টের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সুশীলদার সঙ্গে। আরও পরে তাকে ভালো করে চিনব-জানব। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সহযোগী মনোভাবাপন্ন। কিন্তু তার চরিত্রটা একটা, বলা যায়, ঐতিহাসিক চরিত্র। ধরা যাক, কেউ বলল, সুশীলদা, আজকে কি শওকত স্যার এসেছেন। উনি বলবেন, আমি কি শওকত স্যারের ডিউটি করি। নোটিশ বোর্ড আছে। ওখানে গিয়ে দেখুন।
কেউ হয়তো বলল, সুশীলদা, স্যার কি আসছেন। আমার একটা জরুরি...
জরুরি? আমি কি আপনাদের কাজ তাড়াতাড়ি করি না? জরুরি কেন, আপনি আমাকে বলবেন? ২২ বছর ধরে খেটে যাচ্ছি এই ডিপার্টমেন্টে।
আমি যদি যাই, বলবে, এই যে ভাই, দেখুন, উনি একজন প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, ওর প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না? কর্তব্য আছে না? আপনি দয়া করে চেয়ারটা ছাড়ুন, ওঁকে একটু বসতে দিন। প্লিজ...
একদিন এক ছেলে বসছে তার অফিসের সামনের বারান্দার রেলিংয়ে। উনি তাকে বলেন, এক্সকিউজ মি, আপনি কাইন্ডলি এদিকে আসুন, আমার ঘাড়ে এসে বসুন...
সে যতই বলে, স্যরি, ততই বলেন উনি, শুনুন, আমার দুটো কাঁধ আছে, আপনি দুটোর যেকোনো একটিতে বসতে পারেন, চাইলে দুটোতেই বসতে পারেন, আপনাকে আমি অধিকার দিলাম, কিন্তু আপনি ওখানে বসবেন না।
ছেলে যতই বলে স্যরি, সুশীলদা ততই তাকে পেঁচান। কমসে কম দশ মিনিট তাকে এই জিনিসটা বোঝান।
ধরা যাক, কাউকে বলছেন, আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। বুঝেছেন?
জি বুঝেছি।
না বোঝেননি। কেন বুঝবেন না? আমি আপনাকে ইংরাজিতে বলেছি? উর্দুতে বলেছি? হিন্দিতে বলেছি? না। আমি আপনাকে বাংলায় বলেছি।
ইংরাজি বিভাগে ভর্তি প্রক্রিয়া সুশীলদার অশেষ কৃপায় সুসম্পন্ন হয়।
ইংরাজি বিভাগে আমি প্রথম ক্লাস করতে যাচ্ছি। মনের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনার ঝড় নীরবে অদৃশ্যভাবে বয়ে যাচ্ছে। ক্লাসের পেছনের দিকে বসি। প্রথম ক্লাসটা নিতে আসেন একজন স্যার। তিনি দেখতে কেমন আমি জানি না। স্যারই নিজের পরিচয় দেন, আমার নাম খোন্দকার আশরাফ হোসেন। স্যার পড়াচ্ছেন শুটিং এন এলিফ্যান্ট।
খোন্দকার আশরাফ হোসেন চমৎকার পড়ান। অসম্ভব সুন্দর কণ্ঠস্বর। অসম্ভব সুন্দর বাচনভঙ্গি। আমি অভিভূত হই। যাক, বিভাগ-পরিবর্তন করাটা ভুল হয়নি। আমি মনে মনে আব্বা আর আপাদেরকে ধন্যবাদ দেই।

২২.

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের মধ্যে দাবা খেলা প্রতিযোগিতা হবে। আমাদের নামে চিঠি আসছে। আমি আর স্বপন, দুজনেই ভালো দাবা খেলি। এক বিকালে রওনা দেই পল্টনে দাবা ফেডারেশ অফিসের দিকে।
হলের সামনেই রিকশা পেয়ে যাই। কথাটা বলা সহজ, কাজটাও কঠিন নয়। কিন্তু রিকশা পাওয়া মানে চক্ষুষ্মানরা যে রকমভাবে পায়, সেই রকম নয়। আমরা তো আর দেখি না, যেমন আমার দশ বছর পর্যন্ত দেখতে পাইতাম, ওই যে দূরে একটা রিকশা দাঁড়ায়া আছে, বা বসে আছে, ডাক দিলাম, এই খালি, মর্জি হলে রিকশাওয়ালা এসে গেল, এখন তো ব্যাপার সে রকম না।
আমাদের হলের কোথায় কী, সেটা মোটামুটি আন্দাজ হয়ে গেছে।
আমি আর স্বপন, রওনা হই। আমরা সাধারণত দুজন দুজন চলাফেরা করি। তবে প্রয়োজন থাকলে আমি একাও

যাই। জীবনে বহুবার আমি একা একা ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাতায়াত করছি। আমি এমনকি দৌড়ায়া বাসেও উঠতে পারি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি একেবারেই অন্ধ। আমার কাছে চারদিক সব সময় ঘন অন্ধকার। কি দিন, কি রাত। কি ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে, কি জ্বলে নাই।

যা-ই হোক, রিকশার শব্দটা আমরা টের পাই। যেই দেখলাম রিকশা সামনে দিয়ে যাইতেছে, বললাম, এই রিকশা খালি নাকি?

একটা রিকশা দাঁড়ায়।

কই যাইবেন?

তার মানে খালি।

পুরানা পল্টন। বায়তুল মোকাররমের সেকেন্ড গেট। দাবা ফেডারেশন?

যামু।

কত লইবা?

২০ টাকা।

কী মিয়া বিশ টাকা। ১৫ টাকা পাইবা। যাবা?

আর দুইটা টাকা দিয়েন স্যার, গরিব মানুষ।

কী মিয়া গরিব মানুষ। খাইটা খাও না! বেশি নিবা ক্যান? চলো মিয়া।

ওঠেন।

এবার ওঠার পালা। আমাদের হাতে সাদা ছড়ির বালাই নাই। আমি অন্ধ, এইটা যেন আমরা ঠিক বলে বেড়াতে চাই না।

রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই কিন্তু আমি, সম্ভবত স্বপনও, ঠিক আন্দাজ করে নেয় রিকশাটা কোথায়, আর কোনদিকে মুখ করে দাঁড়ায়া আছে। যেমন বাসের জন্যে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াইলে বাস যখন শব্দ করে এসে থামে, আমি টের পাই, বাস আসছে এবং দাঁড়াইছে। তারপর বাসের হেলপারের বাস চাপড়ানো থেকে বুঝে নেই বাসটা কোথায়, দরজাটাই-বা কোথায়, দরজার কাছে গিয়া হাতড়ায়া কোনোমতে একবার হাতলটা ধরে ফেলতে পারলেই হইল, সিঁড়িতে পা আপনাআপনিই চলে আসে।

রিকশায় উঠে বসি। রিকশা চলতে শুরু করে।

ঠিক দাবা ফেডারেশনের সামনে এসে দাঁড়ায়। এই যে কথাটা বললাম, এটাও অনুমাননির্ভর।

আমরা তাকে বলি, এইটা দাবা ফেডারেশন, তুমি ঠিক জানো।

জি। এইটাই ওইটা।

এবার ভাড়া দেবার পালা। আমার বাবা বড়লোক, আদমজীতে আরেকটা বাসা কিনছে, আমিই তো টাকা দিব। মানিব্যাগ বার করি। দুইটা দশ টাকার নোট বার করতে হবে।

এটা একটু সমস্যা বটে। কারণ বাংলাদেশের টাকার গায়ে ব্রেইলে কোনো কিছু লেখা থাকে না। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্যে টাকায় এমন কোনো চিহ্ন থাকে না, যেটা দিয়ে আমি নিশ্চিত হইতে পারি এই নোটের মুদ্রামান কত!

তবে টাকার আকারটা মোটামুটি অনুমান করা যায়।

এখন একটা টাকা কেউ আপনাকে দিল, আপনি তো তার সামনে টাকাটার চারদিকে আঙ্গুল বুলাইতে পারেন না।

কাজেই রিকশাভাড়া দিতে গিয়া আমি জীবনে তিনবার ঠকছি। দোকানদাররা ঠকাইছে বার দুয়েক।

আন্দাজের ওপরে দুইটা দশ টাকার নোট দেই।

রিকশাওয়ালা পাঁচ টাকা ফেরত দিলে (সম্ভবত) সেটা মানিব্যাগের ভেতরে চালান করে দেই।

এখন কোনদিকে হাঁটব। ডানে, নাকি বাঁয়ে। মাঝেমধ্যে অবশ্য লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

এইখানে জিজ্ঞাসা করার দরকার পড়ে না। কারণ যেহেতু এটা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের দাবা, আমাদেরকে রিসিভ করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করাই ছিল। ওরা হাত ধরে আমাদের পথ দেখায়া দেয়।

হলে ঢুকে দেখি (আসলে শুনি) অনেক আওয়াজ হচ্ছে। অনেকেই আসছে তার মানে। আসারই কথা। আজকে উদ্বোধন হইতেছে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ডদের জন্যে বিশেষ দাবা টুর্নামেন্টের। অধ্যাপক রাজ্জাক স্মৃতি দাবা প্রতিযোগিতা।

আমাদেরকে বসানো হয়। বক্তৃতা হয়। খাবারের প্যাকেট দেয়া হয় প্রত্যেকের হাতে। আমরা প্যাকেট খুলে কেক-সমুচা বের করে খাই।

খাবার পরে পানি খাওয়া দরকার।
পাশেই একটা নারীকণ্ঠ কলকল করে বাজছে।
আমি বলি, আপু, এখানে পানি পাওয়া যাবে কোথায়? আমাদের একটু পানি খাওয়া দরকার।
আপু জবাব দেন, পানি খাবেন। আচ্ছা আপনারা বসেন। আমি এনে দিচ্ছি।
আমরা বসে থাকি। উনি চলে যান। স্বপন বলে, দোস্তো, মেয়েটার ভয়েস তো খুব সুন্দর। মেয়েটার সাথে আরও কথা বলা দরকার।
আমি বলি, আরও কথা বলা দরকার নাকি? আচ্ছা আমি বলতেছি।
এই নেন পানি। আমি হাতড়ে গেলাস ধরি। পানি খাই। স্বপনও।
এবার আমি বলি, আপু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আমার আরও এক গেলাস পানি দরকার। এনে দিবেন?
নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আপু আবার যান পানি আনতে।
এবার পানি আনলে আমি সেটা নিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি, আপু কয় গেলাস আনছেন?
এক গেলাস।
আহা আপু। দুই হাতে দুই গেলাস আনতেন। আমার না আরও এক গেলাস পানি খেতে হবে।
আপুর দয়ার শরীর। তিনি আরও এক গেলাস পানি এনে আমার সামনে ধরেন।
আমি বলি, আপু এইবারও কি এক গেলাস আনছেন?
হ্যাঁ। কেন।
থাক লাগবে না।
না না, লাগবে না কেন। আমি আনতেছি।
আপু এইবার দুই গেলাস আনেন। বলেন, এইবার দুই গেলাস আনছি।
আমি বলি, আরে এইবার তো এক গেলাস হলেই হতো। আচ্ছা আপনি এনেছেন, অবশ্যই খাব।
এক গেলাস খেয়ে আরেক গেলাস হাতে ধরে রেখে আমি বলি, আপু, আপনার বাসা কোথায়?
মিরপুর।
মিরপুর। ওখানে তো আমরা দুইজনেই পড়েছি।
তাই নাকি? কোথায়?
স্যালভেশন আর্মি স্কুলে।
আচ্ছা।
আপু আপনি এখানে কেন? এখানে তো ভিজুয়ালি ইমপেয়ার্ডদের দাবা হচ্ছে, তাই না। আপু আপনি এখানে কী করছেন?
আমি? আমি টুর্নামেন্ট কমিটির ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করতেছি।
আচ্ছা আচ্ছা।
আপু তাহলে তো আপনি টুর্নামেন্টে আরও আসবেন।
হ্যাঁ। টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার দিন পর্যন্ত আমি আসব।
আচ্ছা, আচ্ছা।
আপনারা দুইজনই খেলবেন?
হ্যাঁ। আমার নাম আজাদ। আর ও আমার বন্ধু স্বপন। আমরা দুইজনই খেলব। আপু আপনার নাম?
রুনা।
খুব সুন্দর নাম আপু। আপু, আরেকটা কথা বলি?
বলেন।
আপনার কণ্ঠস্বরও খুব সুন্দর।
থ্যাংক ইউ। এই আমি ওইখানে, একটু কাজের জন্যে ডাকতেছে। ওইখান থেকে আসতেছি।
আপু চলে যান। আমাদের ধ্বনির জগৎটাকে আরেকটু সুরেলা আরেকটু সংগীতময় করে দিয়ে গেলেন।
এইভাবে পরিচয়। আমাদের খেলা ছিল প্রথম দিনেই।
খেলতে বসি।
আমার সামনে যিনি খেলতে বসেছেন, তিনিও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী।

গুটি বসানো আছে। হাত দিয়া স্পর্শ করে দেখে নেই, সব ঠিক আছে কি না।
প্রথম চাল দেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।
চাল দিয়া উনি মুখে জানায়া দেন কী চাল দিলেন।
এবার আমার পালা। খেলার শুরুতে সৈন্য আগাতে হবে, এই তো। দাবার গুটিগুলোও কিন্তু বিশেষ রকম। আর গুটিগুলান যাতে সহজেই স্থানচ্যুত হইতে না পারে, সে জন্যে নিচে একটা করে পিনের মতো দেওয়া থাকে, সেটা বোর্ডে গেঁথে গেঁথে চাল দিতে হয়।
খেলা চলে। আমি জিতে যাই।
আপনি তো বেশ ভালো খেলেন।
রুনা আপুর গলা! শুনে সমস্ত শরীরে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।
সমস্যা হলো, এখন আমার বাথরুম পাচ্ছে।
কিন্তু আপুকে কী করে বলি, আপু আমার বাথরুম পাচ্ছে! আমাকে একটু বাথরুমে নিয়ে চলেন না!
কী মুশকিল।

২৩.

পরের দিন আবার খেলা। বিপুল উৎসাহে দাবা ফেডারেশনের দিকে যাই। যাবার আগে আমার সুন্দরতম শার্টটা, প্যান্টটা, জুতাজোড়া বের করে পরে নেই। পারফিউম স্প্রে করি বেশি করে।
দাবা ফেডারেশনের হলে ঢুকি। কান পেতে থাকি, কোথাও রুনা আপুর গলা শোনা যায় কি না।
খেলা চলার এক পর্যায়ে দূরে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মনটা উদ্বেল হয়ে থাকে। তারপর একসময় তিনি কাছে আসেন। বলেন, এই যে, কী অবস্থা আপনার!
অবস্থা কীভাবে জানাব?
আপনি আর একটু পরে এলে তো আমি হেরেই যেতাম। মনে মনে বলি।
আজকেও জিতে যাই।
তারপর আপুর সঙ্গে গল্প করি।
আপু, আপনি কোথায় পড়েন?
লালমাটিয়া কলেজে।
কী পড়তেছেন?
ডিগ্রি দিব।
আমরা আপু পড়ি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। আমি ইংলিশে। ও ল।
আপু আপনি আজকে কী পরে এসেছেন? জিজ্ঞাসা করি।
আপু চুপ করে থাকেন।
আপু? কী রঙের জামা পরে এসেছেন?
আমি পরেছি নীল রঙের জামা!
আপনাকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে?
আমি কেমন করে বলব।
আপু আপনার ভয়েস তো খুব সুন্দর। আপনিও নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর। নীল রঙের জামায় নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।
আমি আসলে বোরকা পরে আছি তো। বোরকায় আবার কেমন দেখাবে আমাকে!
এই রে। শেষ পর্যন্ত এক বোরকাওয়ালির কণ্ঠে মুগ্ধ হলাম!
স্বপন কিন্তু কোনো কথা বলত না। স্বপন মেয়েদের সঙ্গে মেশাটাকে অপছন্দ করে। আমি আবার মেয়েদের ভেতরে ভেতরে খুবই পছন্দ করি।
মোট পাঁচটা খেলায় জিতলাম। পাঁচ দিন কথা হলো রুনা আপুর সঙ্গে। তারপর যেদিন হেরে গেলাম দাবায়, সেদিন মনটা খুব দমে যায়। দাবায় হেরেছি বলে নয়, আপুর সঙ্গে আর দেখা হবে না বলে।
আপুকে জানাই সেই কথা। আপু, এত দিন আসতাম, খেলা ছিল, আজকে হেরে গেছি, কাল থেকে আর আসতে হবে না, মনটা খুব খারাপ লাগছে, আপনার সাথে আর দেখা হবে না, কথা হবে না, সেই জন্যে।

আপু বলেন, আমারও খারাপ লাগছে।
আমি বলি, আপু আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি দেবেন?
আপু মোবাইল নাম্বারটা দেন।
দাবা ফেডারেশন এলাকা থেকে বার হয়ে সোজা চলে আসি ইস্টার্ন প্লাজা। একটা মোবাইল সেট কিনি। ছোটবেলা থেকেই নানা যন্ত্রের প্রতি আমার অপার আকর্ষণ।
মোবাইল জিনিসটা হাতে পেয়ে এইটাকে একেবারে হেফজ না করে আমি ছাড়বার পাত্র নই। কিছুদিনের মধ্যেই মোবাইলে যে-কাউকে ফোন করা, ফোন রিসিভ করা এমনকি মেসেজ পাঠানো আমার কাছে হয়ে ওঠে ছেলেখেলা।
রুনাকে মেসেজ পাঠাই। রুনাও উত্তর দেন।
রুনাকে ফোন করি।
রুনাও ফোন করেন আমার মোবাইলে।
কত হাবিজাবি কথা যে হয়।
ফোনে একদিন তাকে বলি, আপু, আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করতেছে।
উনি বলেন, আপনি না বললেন, আপনি চোখে দেখেন না!
ওই তো। আপনার কথা শুনব।
কথা তো এখনো শুনতেছেন।
না সামনাসামনি শুনব। মোবাইলে ভয়েস তো কেমন মেটালিক, কেমন যান্ত্রিক শোনায়।
হুঁ।
হুঁ কী?
এই যে মোবাইলে ভয়েসটা যান্ত্রিক শোনায়।
আপু আসেন-না, প্লিজ। না হলে বলেন, আমি যাই আপনার কাছে।
আসা যায়! না থাক!
না থাকবে কেন আপু! প্লিজ আসেন।
না আসব না।
তাহলে আর ফোন করবেন না।
এর সাথে ফোনের কী সম্পর্ক?
না, আপনার সাথে আর কথা বলব না।
আচ্ছা বলবেন না।
আমি ফোন কেটে দেই। জানি, এখনই আবার কল আসবে।
কল আসে।
আমি বলি, কল করছেন কেন? আমি তো কথা বলব না আপনার সাথে!
বলবেন না।
তাহলে কল করলেন কেন?
আমার ইচ্ছা।
ইচ্ছা হলেই কল করবেন। বিল উঠতেছে না।
উঠলে আমার উঠতেছে।
না, কল করছেন কেন। এখন আপনাকে আসতে হবে।
আচ্ছা আসব, যান।
আজকেই আসেন।
আজকে না। কালকে আসব।
কয়টায় আসবেন?
আপনার ক্লাস শেষ হলে।
আমার কালকে ক্লাস নাই।
এই, মিথ্যা কথা বলে না। আচ্ছা, কালকে বিকাল তিনটায় আসব।
কবে আগামীকাল আসবে? কবে বিকাল তিনটা বাজবে। পৃথিবী কি তার আহ্নিকগতিটা একটু বাড়াতে পারে না!

আমরা তখন সূর্যসেন হলে সোহেল ভাইয়ের রুমেই থাকি।
পরের দিন বিকাল তিনটায় তিনি আসেন না। সাড়ে তিনটাতেও আসেন না। তিনটা চল্লিশে মোবাইলে তার রিং বাজে। তাড়াতাড়ি করে ফোন ধরি। আমার গলা কাঁপছে। হ্যালো...
আমি হলের সামনে এসে গেছি। আসেন নিচে...
আমি আর সৃপন তৈরি হয়েই ছিলাম। দুজনে নিচে নামি। হলের সামনে যাই। এখন উনি যদি আওয়াজ না দেন, ওনাকে তো আর দেখা যাবে না। মোবাইলে তো নিজের অবস্থান সম্পর্কে লোকে বাড়ায়া বলে। কেউ সত্য বলে না। হয়তো উনি আসেন নাই, আওয়াজ দিছেন যে আসছেন। তাও তো হতে পারে। তাই না!
উনিই বলেন, কেমন আছেন?
আসছেন তাইলে আপনি?
আমরা তাকে নিয়ে সূর্যসেন হলের গেস্টরুমে বসি। গল্প করার উপায় নাই। অতিথি কক্ষে আরও গেস্ট আর তাদের হোস্টরা।
আমরা উঠে ইউনিভার্সিটির মল চত্বরের দিকে যাই। আমগাছের নিচে বসি। ঝালমুড়ি খাই। গল্প করি। ঝালমুড়ি রুনার সবচেয়ে প্রিয় খাবার।
এইভাবে চলতেছে।
এসএমএস পাঠাই। তারপর অপেক্ষায় থাকি। কখন রিপ্লাই দেয়।
একদিন, তার জন্মদিনের আগে আগে, আমি তাকে এসএমএস পাঠাই শেক্সপিয়ারের ১৩০ নম্বর সনেটের শেষ দুইটা লাইন: 'ইয়েট, বাই হেভেন, আই থিংক মাই লাভ ইজ রেয়ার,/এজ এনি শি বিলায়েড উইথ ফলস কমপেয়ার।'
মানে, আমার ভালোবাসা যতই বিশ্রি হোক না কেন, তার পরও পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলে না। এটা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলা যায়।
উনি উত্তর দেন। কী বলতে চান, বোঝা যায় না।
একবার লেখেন, আই লিভ অন লাভ।
এইভাবে চলতেছে। উনি মাঝেমধ্যে আসেন। আমাকে নিয়ে বাইরে যান। আমরা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে যাই। উনি খাওয়ান। আমি খাই।
আমি খাওয়াই। উনি খান।
একদিন সৃপন বলে, আপনারা আপনাদের সম্পর্কটাকে কোন পর্যায়ে নিতে চান?
উনি বলেন, কোন পর্যায়ে নিতে চাই, এটা তো আর ভেবে ঠিক করা যাবে না। চলতে থাকবে। যেই পর্যায়ে যায় আর কি!
এইভাবে আর ভালো লাগে না।
আমার মনে হয়, এবার স্ট্রেটকাট বলে দেব, ভালোবাসি।
এসএমএস পাঠাই, ফর গড'স শেক হোল্ড ইয়োর টাং, অ্যান্ড লেট মি লাভ।
একদিন বলি, শোনেন, আমি কিন্তু স্ট্রেট ফরোয়ার্ড মানুষ, একটু ঠোঁটকাটা ধরনের, আমি যা বলব, সরাসরি বলব, আমি কিন্তু আপনাকে আপা, কিংবা বন্ধু, এইসব হিসাবে দেখি না।
কী হিসাবে দেখেন? তিনি বলেন।
সেটা বুঝতেছেন না আপনি। বলে দিতে হবে?
না বুঝতেছি না। বলেন।
আচ্ছা আমি পরে মেসেজ পাঠাচ্ছি।
পরে এসএমএস পাঠালাম:
'মানি বিগেটস মানি
লাভ বিগেটস লাভ।'
'টাকায় টাকা আনে, ভালোবাসা আনে ভালোবাসা।'
উনি জবাব দেন, ভালোবাসা কষ্টও আনে। লাভ বিগেটস পেইন।
এই রকম চলতেছে। উনি প্রায়ই আসেন। নীলক্ষেতের রেস্টুরেন্টগুলোয় আমরা খাই। উনি আমার পাতে খুব সুন্দর করে খাবার তুলে দিতে পারতেন।
একদিন মোবাইলে বলি, আমার জন্যে আপনার কোনো ফিলিংসই নাই।

উনি, তখন সন্ধ্যা, হলে চলে আসেন। শাড়ি পরে। বলেন, আপনার জন্যে ফিলিংস না থাকলে শাড়ি পরে আসি।
রুনা শাড়ি পরে আসছেন। কিন্তু তাকে কী রকম দেখাইতেছে, আমি কোনো দিনও দেখতে পাব না।
তিনি আমার হাতখানা কোলের মধ্যে নেন। আমার চোখ দিয়ে জল গড়ায়। ভালোবাসা বেদনাও আনে। অশ্রুও ডেকে আনে। বেদনার অশ্রু। সুখের অশ্রু। অসুখেরও।

২৪.

২০০২ সালের জুন মাসের তিরিশ তারিখে, বারবার যে আশঙ্কাটা বারবার করা হইতেছিল, আর যেটা বাস্তবে কোনো দিনও ঘটবে না ভেবে আমরা উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুজে থাকতাম, সেই ঘটনাটা ঘটে।
আদমজী মিল বন্ধ হয়ে যায়।
বাসা থেকে ফোন আসে, রুজির কণ্ঠে কান্না, ভাইজান, আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের স্কুল আর কোনো দিনও খুলবে না।
তোরা না সেইদিন নতুন স্কুলে গেলি।
হ্যাঁ। নতুন স্কুলে আসছি। তাই ভাবছি নতুন স্কুল বিল্ডিং কেবল চালু হইল, এখন কি আর এইটা বন্ধ হবে। আমাদেরকে বলে দিছে, আর স্কুল খুলবে না। স্কুল বিল্ডিংয়ে পুলিশ-বিডিআর এরা এসে উঠছে।
রুজির কাছ থেকে ফোন নেয় জেসমিন। রুজি পড়ে নাইনে, আর ও সিক্সে। মামা, আমাদের কী হবে? আমরা এই স্কুলে আর পড়ব না!
আম্মা ফোনে বলেন, বাবা, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখতেছি। এই বাড়িও ভাইঙ্গা ফেলবে। তোর আব্বার দোকানও ভাঙবে। আমাদেরকে সবকিছু ছাইড়া দিতে হবে। এখন আমরা যামু কই। করমু কী। খামু কী?
আর মিলের শ্রমিকরা, বাবুরা, অফিসাররা, তাদের ফ্যামিলি, ৩০ হাজার মানুষ ওরা যাবে কই?
তুই আয়। দেইখা যা। সবাই চইলা যাইতাছে। সবাই তো ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতাছে। কারও কোনো গরজ নাই। কিন্তু আমগো তো কোনো ক্ষতিপূরণ নাই। এই বাড়ি আমরা কিনছি। কিন্তু তার তো কোনো দলিল নাই। দোকানের পজেশন। তার কোনো মা-বাপ নাই। আমরা ফকির হইয়া যামু।
আম্মা মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি বলতেছেন। আমরা পথের ফকির হয়ে যাব?
আমি ঢাকা থেকে আদমজীর দিকে রওনা হই।
গিয়ে দেখি (আসলে শুনি), পরিস্থিতি আসলেই ভয়াবহ রকমের করুণ। পুলিশ, বিডিআর দিয়ে পুরা এলাকা গিজগিজ করতেছে। সবাই কারখানা এলাকা ছেড়ে চলে যাইতেছে। কলোনিগুলো সব খালি।
কারখানার সেই শব্দ আর নাই।
আধঘণ্টা পরপর সাইরেন আর বাজতেছে না।
আব্বার দোকানের আজকেই শেষ দিন। কালকে ওই মার্কেট ভেঙে ফেলা হবে।
শ্রমিক-কর্মচারীদের সবার হাতে হাতে পে-অর্ডার দিয়ে দেওয়া হইতেছে। উপদেশ দেওয়া হইতেছে, নিজের নিজের এলাকায় গিয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে পে-অর্ডার জমা দিবেন, যাতে কোনো চাঁদাবাজ জ্বালাতন করতে না পারে।
আব্বা আসেন একটু পরে।
তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছেন: তিনটা হোটেলের মালিকের কাছে তিনি প্রায় আট লক্ষ টাকা পান। রাতের অন্ধকারে সেই হোটেল বন্ধ করে মালিকেরা চলে গেছে নিরুদ্দেশের পথে। তিনি দুইটা গেট পাহারা দিয়ে রাখছিলেন। কিন্তু আরও তো গেট আছে।
আমাদেরকেও আগামীকালের মধ্যে এই বাসা ছেড়ে দিতে হবে।
চারদিকে শুধু ভাঙনের শব্দ, চারদিকে শুধু বসতি উঠে চলে যাবার আওয়াজ, চারদিকে শুধু এত দিনের স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নেবার কান্না, চারদিকে শুধু যবনিকা পতনের করুণ বেহাগ।
আমার বুক ভেঙে আসে। আব্বাকে আমি কখনো এর আগে কাঁদতে দেখিনি।
আমাদেরও একটা ঠিকানা জোগাড় করতে হয়। নারায়ণগঞ্জে একটা বাসাভাড়া নিয়ে আমরা জিনিসপত্র ঠেলাগাড়িতে তুলি।
সেইসব বাঁধাছাঁদা, গোছগাছ নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটে। আব্বার দোকানের কাকা আমাদের সঙ্গে এসে হাত লাগান। বড় আপা তো চিরকালই করিতকর্মা, মেজ আপাও কম কাজের নন, পুরো সংসারটা বেঁধে ফেলতে বেশি সময় লাগে না।

বড় আপা, মেজ আপা আগে আগে চলে যান নতুন বাসায়।
শেষতম জিনিসটা ঠেলাগাড়িতে তুলে দিয়ে আমি আর আম্মা একটা রিকশায় উঠি।
আমি বলি, আম্মা, আমরা কি এখন মার্কেটটা পার হচ্ছি?
হ্যাঁ বাবা।
আম্মা, আমরা কি এখন পুকুরটার পার দিয়ে যাচ্ছি।
হ্যাঁ বাবা।
আমরা কি এখন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিসটা পার হলাম।
হ্যাঁ বাবা।
আম্মা, রোজি-জেসমিনের স্কুলটা কি এখনো দেখা যাচ্ছে?
যাচ্ছে।
আম্মা, বাবুর স্কুলটা কি এখনো আছে?
আছে। ভিতরে পুলিশ।
আম্মা নতুন বাসাটা নিশ্চয়ই আরও সুন্দর হবে। আম্মা তুমি কাঁদবা না। বলতে বলতে আমি নিজেই কাঁদতে থাকি।

২৫.

আদমজী জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে। এইটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার আগে অবিভক্ত বাংলায় পাটকল ছিল ১০৮টা, '৪৭-এর পর সবগুলাই পড়ে ভারতের ভাগে। পাকিস্তান সরকার মুসলিম শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তানে এসে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে। কলকাতার বিখ্যাত আদমজী ভাইয়েরা ১৯৪৯ সালে পাটশিল্পে বিনিয়োগের একটা প্রস্তাব নিয়া আগায়া আসেন। ৫০ শতাংশ পুঁজি দেন আদমজীরা, বাকিটা দেয় পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন। ঢাকার অদূরে, নারায়ণগঞ্জ থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তরে, নদী, সড়ক ও রেলযোগাযোগের সুবিধার কথা ভেবে এই কারখানার সাইটটা বাছাই করা হয় সিদ্ধিরগঞ্জে। ২০৭ একর জমি অধিগ্রহণ করে উন্নয়ন করা হয়। ১৯৫৫ সালে চালু হয় কলটি। ১৯৭১ সালের পর মিলটিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশন '৭২ সালে এটার দায়িত্ব নেয়। তারপর থেকেই শুরু হতে থাকে সমস্যা। এর আগে মিলের ব্যবস্থাপনা দেখত আদমজী পরিবার।
সরকার এটিকে নিয়ে নেবার পর থেকেই শুরু হয় লোকসান। লোক বেশি, নিয়মশৃঙ্খলার অভাব, শ্রমিক রাজনীতি, দুর্নীতি–সব মিলিয়ে উৎপাদন কমতে থাকে, গুণগত মানও খারাপ হয়।
শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ওটা একদিন বন্ধ করলে যত লোকসান, চালালে তার চেয়ে বেশি লোকসান। দাতারা প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে ওটা বন্ধ করে দেবার জন্যে।
বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেই দাতাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত সংস্কারের প্রধান পদক্ষেপ হিসাবে আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেবার প্রক্রিয়া শুরু করে।
দাতারা খুশি হয়।
শ্রমিক নেতারা প্রচুর টাকা পান।
শ্রমিকরাও অনেকেই অনেক টাকা পান।
আদমজী বন্ধ হয়ে যায়।
কিন্তু হিসাবের বাইরেও থাকে হিসাব।
গোপনে কোথাও কোথাও ঘটে যায় মানবিক বিপর্যয়।
অর্থনীতি, ফিন্যান্স, বাণিজ্য ক্লাসে সেইসব পড়ানো হয় না।
সাহিত্যের ক্লাসে আমরা সেসবের কথা হয়তো পড়ি। পড়ি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ব্যক্তিমানুষের জীবনের কথা, মনের গভীরের গোপন-প্রকাশ্য আনন্দ-বেদনার কথা।
কিন্তু নিজের জীবনও যে রাষ্ট্রের এই রকম একটা ছোট্ট সিদ্ধান্তের কারণে এলোমেলো হয়ে যাবে, আমি প্রথম প্রথম সেইটা বুঝতে পারি নাই।
এরপরে সেটা আমাকে বুঝতে হবে, অনেক রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়া।

২৬.

আমরা যে খুব গরিব হয়ে গেছি, সেটা বুঝতে আমার আরও কিছুদিন সময় লাগে। আব্বার কিছু জমানো টাকা ছিল। আব্বা আমাকে প্রত্যেক মাসে তা থেকে টাকা পাঠান।
কিন্তু আব্বা হয়ে পড়েন পরিপূর্ণ বেকার। তিনি চাচ্ছিলেন, বিভিন্ন হোটেল মালিকদের কাছ থেকে তার পাওনা লাখ আটেক টাকা আদায় করে আবার একটা ব্যবসাপাতি শুরু করতে।
কিন্তু কোথায় তার দেনাদাররা?
আর তাদেরকে পাইলেই-বা কী লাভ হইত?
কারও কাছে তো টাকাপয়সা নাই। কারণ তাদেরও হোটেল উঠে গেছে। তারাও এখন কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে দিশাহারা।
আমি নারায়ণগঞ্জের বাসায় যাই না।
গেলেই আম্মার কান্না।
আব্বার দীর্ঘশ্বাস।
রুজি কিছু বলে না। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শুনলেই আমি বুঝি, ওর মনের মধ্যে কী প্রচণ্ড দুঃখ। সত্যি সত্যি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, আর এই স্কুলে তারা যেতে পারবে না কোনো দিনও, এইটা বুঝতে পেরে ও চার দিন চার রাত প্রচণ্ড কান্দছে। কান্দতে কান্দতে সে চোখ ফুলায়া নাকি ফেলেছিল।
জেসমিনেরও একই অবস্থা।
ওদের শেষ স্কুলের দিনের কান্নাকাটি চ্যানেল আইয়ের খবরে বিস্তারিত দেখানো হইছিল।
বড় আপা আছেন সংসারে ছাতা হয়ে।
মেজ আপা চলে গেছেন শ্বশুরবাড়ি। তার জামাইও তো তেমন কিছু করে না। কী করতেছে, কী খাইতেছে ওরা, আল্লাহ জানে। ছোট্ট দুইটা বাচ্চা আছে ওদের।
আর আব্বার কথাবার্তাও আমার কাছে অসংলগ্ন মনে হয় ইদানীং। আমাকে হঠাৎ সেদিন বললেন, আজাদ, অনেকদিন সিনেমা দেখি না। চল একটা সিনেমা দেইখা আসি সিনেমা হলে গিয়া।

২৭.

আব্বা আমাকে শেষ দুই হাজার টাকা পাঠান প্রথম বর্ষ ফাইনালের ফরম ফিলআপ করার জন্যে। বলেন, বাবা, আর টাকা নাই। তারপর তারা রওনা হয়ে যান লাকসামের মনোহরগঞ্জের ডাকাতিয়া নদী তীরবর্তী সেই গ্রামের উদ্দেশে।
এ আর এক কাহিনী।
আম্মার কাছ থেকে পরে আমরা সব জানতে পারব। দুইটা ট্রাক নিয়া তারা রওনা হন নারায়ণগঞ্জ থেকে, গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে। ট্রাকে আমাদের যাবতীয় অস্থাবর সম্পদ, সেগুন কাঠের খাট আর কাঁঠাল কাঠের আলমারি, আব্বার দোকানে রাখা ফ্রিজ, একটা রঙিন টেলিভিশন, বড় আপার সেলাইমেশিন, ট্রাংক ট্রাংক কাপড়চোপড়, হাঁড়িকুড়ি, থালাবাসন, বিছানা-বালিশ, ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, বেতের সোফা ইত্যাদি।
পথে ট্রাক দুর্ঘটনায় পড়ে। টিভি সেট ও ফ্রিজ ভেঙে যায়।
মানুষের কপাল ভাঙে কিন্তু এইভাবে?
আমরা তো পথের ফকিরই ছিলাম, শুধু টিভি আর ফ্রিজটা বাদ দিলে আর কিছুই নাই আমাদের, সে দুইটাও গেল। তবে নিয়তি পরিহাসপ্রিয়, দুর্ঘটনা ঘটার সামান্য আগে আব্বা ওই ট্রাক ছেড়ে এই ট্রাকে এসে উঠছিলেন। ফলে তাঁর কোনো ক্ষতি হয় নাই।
গ্রামে গিয়া রুজি, অধুনালুপ্ত আদমজী গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী এবং ফার্স্ট গার্ল, নিজের পৈতৃক টিনের বাড়িটা দেখে বলে, এটা কার বাড়ি, এটা তো আব্বার দোকানের কাকার বাড়ি, আমরা এই বাড়িতে কেন থাকব? তার সঙ্গে বালিকা জেসমিন ও বালক বাবুও কান্দতে শুরু করে, এই বাড়িতে আমরা থাকতে পারব না।
কিন্তু কান্নার তখনো অনেক কিছু বাকি ছিল।
স্থানীয় মনোহরগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তির জন্যে রুজি আর জেসমিনকে নিয়ে যাওয়া হলে তারা দেখতে পায় শ্রেণীকক্ষে ছাগল চরতেছে।
তারা ঘোষণা করে, ওই স্কুলে তারা পড়বে না।
কিন্তু চোখে অশ্রুর মজুত অসীম নয়, একসময় তা ফুরায়া যায় এবং রুজি ও ফেরদৌস ও বাবু গ্রামের স্কুলে ভর্তি হয়। আর মাইল দুয়েক পথ কাঁচা রাস্তা পায়ে হেঁটে রোজ স্কুলে যাওয়াও তাদের ধাতস্থ হতে শুরু করে।

আব্বা তার পুরোনো সোনালি দিনগুলোর কথা ভুলতে পারেন না। তিনি কিছুই করেন না। মাঝেমধ্যে বকতে থাকেন, এই, আদমজী জুট মিলে সকালের সাইরেন দিছে কখন, তোরা উঠবি না, আমারে দোকান যাইতে হইব না? বকুনি থামে তখন, যখন তার প্রচণ্ড মাথাব্যথা শুরু হয়, তিনি বিছানা গ্রহণ করেন।
আম্মা এরই মধ্যে শেক্সপিয়ার নিজে না পড়লেও তার ছেলের পড়ার সুবাদে শেক্সপিয়ারের ওই সংলাপটিকে বাস্তবে প্রমাণ করার দায়িত্ব নেন যে, বিপদ একা আসে না। তাঁর স্ট্রোক হয়। শরীরের এক পাশটা অবশ হয়ে পড়লে তিনিও বিছানায় মোটামুটি স্থায়ী হন এবং তাঁর দুচোখের কোলে অশ্রু ও কণ্ঠে রোদনও স্থায়ী হয়।

২৮.

আমাদেরকে ইয়েটস পড়তে হচ্ছে এখন।
ডব্লু ইয়েটসের 'ডাউন বাই দ্য স্যালি গার্ডেনস' কবিতাটি পড়ে তো আমি মুগ্ধ। কবিতাটা আমি রুনাকে শোনাই ফোনে। তারপর মানে বলে বলে দেই। শুধু ওকে শোনানোর জন্যে কবিতাটা আমাকে ব্রেইলে লিখে নিতে হয়।
রুনা জানতে চায়, কেন তোমার চোখ এখন জলে ভরা। ভুলটা কোথায় হলো।
আমি তখন কী বলব। রোমান্টিকদের মতোই তখন আমার অকারণ বিষাদ, অকারণ পুলক। কবিতায় কবি কী বোঝাতে চাইতেছেন আমি জানি নাকি।
কিন্তু একদিন আমার চোখ সত্যি সত্যি জলে ভরে উঠবে। সেটা আরও পরে।
আপাতত রুনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আছে। ভাগ্যিস আছে। তাই হয়তো আমি জগৎ-সংসারের নানা বাস্তব দুঃখকষ্ট ভুলে থাকতে পারতেছি।
আজ আমাদের যাবার কথা বোটানিকাল গার্ডেনে। আমি সকাল ১০টার মধ্যে মিরপুরে গিয়াস মামার ফাস্টফুডের দোকানে গিয়ে হাজিরা দিছি। একা একাই গেছি মিরপুর। বাসে চড়ে। আগে হলে হয়তো আজকের দিনে বাসে চড়তাম না। বেবিট্যাক্সি নিয়া আসতাম। কিন্তু এখন তো আমরা আর সচ্ছল নই।
রুনাকে মিসকল দিছি। ও এসে যাবে হয়তো। মেয়েরা যে কী এত সাজগোজ করে।
গিয়াস মামার দোকানে বসে থেকে কী আর করি। একটা সফটড্রিংকের অর্ডার দিলাম।
বাস থেমে নেমে এই দোকান পর্যন্ত একা একা আসতেও আমার এতটুকু অসুবিধা হয় না।
বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নাই। তাদের অধিকার নিয়ে কেউ এতটুকু সচেতন না।
এই যে আমি বাসে আসলাম, আমার কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবার কথা। সেটা যে যানবাহনেই চড়ি না কেন। এই রকম একটা আইন হইছে নতুন।
তার আগে অবশ্য, আইনে আছে, সব প্রতিবন্ধীকে আদমশুমারির সময় তালিকাভুক্ত করা হবে। তাদেরকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।
তাদের লেখাপড়ার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দেশের স্কুলগুলোতে যাতে প্রতিবন্ধীরা পড়তে পারে, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
তারা যাতে বিশেষ কোটায় চাকরি পায়, সেই ব্যবস্থা করবে সরকার।
কোটা? এখনো পর্যন্ত নিয়ম আছে বিসিএস দিয়ে কোনো প্রতিবন্ধী চাকরি পাবে না। কারণ সে তো মেডিকাল টেস্টেই উত্তীর্ণ হতে পারবে না। অথচ আইনে আছে, এই বাধাগুলো তুলে নেওয়া হবে।
এসবই কাগুজে আইন। বাস্তবে নাই।
আর তা ছাড়া প্রতিবন্ধী আইনের ভাষা, শর্ত অনেকগুলোই প্রতিবন্ধীরা নিজেরা পছন্দ করে নাই। করবার মতো নয় বলেই করে নাই। সভা-সেমিনার হইছে। আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হইছে। সরকারি লোকজন বলছেন, এই তো হয়ে যাবে আজকালের মধ্যেই। সেটা আর হইতেছে না।
আমার কাছে একটা ব্রেইলে লেখা প্রতিবন্ধী আইনের কপি আছে।
ভাবতেছি, একদিন ওইটা ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দেব।
কী হবে এই আইনে?
এই কখন আসছেন।
দেবী এলেন!
এই তো কিছুক্ষণ। মুখে বলি।
চলেন।

চলেন। আমি দোকানের বিল মিটায়া দিয়া দেবীর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করি।

বোটানিকাল গার্ডেনে আসলে আমার মনটা ভালো হয়ে যায়। এখানে পাখির কলকাকলি শোনা যায়। বাতাসে গাছের বুনো গন্ধ, পাতার মর্মর। আর কী রকম ছায়া-ছায়া জায়গাটা।

দেখতেও হয়তো সুন্দর! হবেই-বা! নইলে কি আর এটা বোটানিকাল গার্ডেন।

আজকে তোমার মনটা কি বেশি খারাপ? একটা গাছের নিচে আমাকে বসায়া রুনা বলেন।

খারাপই। নানা ধরনের দুশ্চিন্তা হয়। আব্বা তো এখনো কিছু করে উঠতে পারলেন না। খালি পাওনা টাকা পাওনা টাকা করে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াইতেছেন। টাকা তো পাবেনই না। শুধু বসে বসে খেয়ে জমানো টাকাটা শেষ করে ফেললেন।

কাদের কাছে টাকা পান? পুলিশে বললে হয় না?

টাকা যে পান, কোনো প্রমাণ আছে নাকি! সবই তো মুখে মুখে। কোনো ডিড-ফিড তো নাই।

ও।

মনে হয় আব্বাদের নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে দিয়া গ্রামে যাইতে হবে।

গ্রামে কোথায় থাকবে?

আমাদের একটা বাড়ি আছে। বছর দুয়েক আগে আব্বা বাড়িটা রেনোভেট করছিল ভাগ্যিস।

পাকা বাড়ি?

না পাকা না। টিনের বাড়ি। মাটির মেঝে। ওটাতেই গিয়ে উঠতে হবে।

ওই বাড়িতে ওরা থাকতে পারবে?

পারতে হবে।

তোমার ছোট বোন পড়বে কোথায়?

গ্রামের স্কুলে।

রুনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমার শরীরে সেই শ্বাস স্পর্শ বুলায়া যায়।

আমি বলি, বাদ দেন। আপনার কথা বলেন।

আমার কথা? কী বলব?

ওই যে বলছিলেন, আপনি একটা ছেলেকে ভালোবাসতেন। ছেলেটা ড্রাগস এডিক্ট ছিল।

হ্যাঁ ছিল।

তারপর?

তারপর ছেলেটা মারা গেল।

মারা গেল?

হ্যাঁ। হিরোইন নিত তো। হিরোইন নিলে তো শেষ পর্যন্ত মরতেই হয়।

কেউ বাঁচে না?

যদি ছাড়তে পারে। ছাড়া খুব কঠিন।

ওনার কবর কোথায়?

জানি না।

আপনি তাকে এখনো মনে করে কষ্ট পান?

আপনি যেটা ভাবতেছেন, সেটা নয়। কষ্ট পাই। সেটা তাকে হারানোর জন্যে না। লোকটার পরিণতির কথা ভেবে। এইভাবে কেউ মরে। এ তো আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা করছে বইলা আপনি তাকে মনে রাখছেন।

না, আত্মহত্যা করছে বলে না। একটা মানুষ খামাকা খামাকা কষ্ট পেয়ে মরে গেলে খারাপ লাগবে না?

হুঁ। লাগবে।

আমি আত্মহত্যা করলে আমাকে মনে রাখবেন?

এই কথা আসতেছে কোত্থেকা?

না আসতেছে না। এমনি বললাম আর কি! মনটন ভালো না তো। মুখের কথা তাই ঠিক থাকে না।

গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে আমাদের দুইজনের মাথায় শরীরে। আমরা যদি এইভাবে বসে থাকতে পারি অনন্তকাল, ঝরাপাতার দল আমাদেরকে কি ঢেকে দেবে? কে জানে!

আমরা বসে থাকি, বসে থাকি, পাতা ঝরে, পাতা ঝরে পড়ে, শুকনো পাতা, সম্ভবত হলুদ পাতা, ঝরে পড়ে দিনের ক্ষয়াটে আলো পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর ওপরে, আমরা ঢেকে যাই, ঢেকে যেতে থাকি, আমার আব্বা পাওনা টাকা পাওনা টাকা বলে ঘোরেন, জিভ বেরিয়ে যাওয়া কুকুরের মতো হাঁপান, আমার ছোট বোন কান্দতে থাকে স্কুল ও স্কুলের বন্ধুদের হারায়া ফেলে, প্রসন্ন ও রাগী শিক্ষকদের মুখগুলো হারিয়ে ফেলে, আমার মেজ আপা শ্বশুরবাড়িতে যান এবং আলোহীন চোখ নিয়ে ডাল রানতে গিয়া আন্দাজে নুন বেশি দিয়ে ফেলেন, আমি আর রুনা বসে থাকি, বোটানিকাল গার্ডেনের পাতা আমাদের ঢেকে দিতে থাকে।

গাছ থেকে পাতা ঝরে, বোটানিকাল গার্ডেনে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলে, রমনায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, আবার সবুজ নব কিশলয় নিশ্চয়ই গজিয়ে ওঠে। অন্তত যখন আমার দুই চোখ ছিল, আমি এই পৃথিবীতে, এই বাংলাদেশে ষড়ঋতুর এমনি নিয়মই রেখে ও দেখে আসছিলাম।

আমি রুনার সঙ্গে কথা বলি। তবে এখন আর কল করি না মোবাইলে, কেবল মিসকল দেই। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া চলাফেরা খুবই ব্যয়বহুল। আমাদের ব্রেইলের একটা কাগজের দাম দশ টাকা। কোথাও যেতে হলে আমাদের সাধারণত হয় রিকশা, নয়তো অটোরিকশা, নয়তো ট্যাক্সি ভাড়া করতে হয়। কোনো পরীক্ষা থাকলে একজন রাইটার জোগাড় করতে হয়, যার পেছনে বাস্তবে কিছু টাকা খরচ না করে পারা যায় না। একটা গল্পের বই বা পড়ার বই পড়তে হলে একজন রিডার ভাড়া করতে হয়, যে কিনা বইটা পড়ে শোনাবে এবং বিনিময়ে একটা কিছু লাভ করবে। আমি দ্রুত বুঝে উঠতে থাকি আমার চারপাশের জলাধারগুলো শুকায়া যাইতেছে।

এখন আমি যদি সমুদ্রের দিকে তাকাই, তাও শুকায়া যাবে।

আব্বা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিছেন।

অথচ আমার খরচের হাত খুবই বড়সড়।

টাকার প্রয়োজনে আমি ধার-কর্জ করতে শুরু করি। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শোধ করি না।

মোবাইল ফোনটা এখন আমার কাছে বিলাসিতা মনে হয়।

আমি সেটটা বিক্রি করে দেই কোনো এক বন্ধুর কাছেই।

আমাকে মোবাইলে কোনোভাবেই ধরতে না পেরে রুনা হলে ছুটে আসে। জিজ্ঞাসা করে, মোবাইল কী করছ?

আমি জানাই, নির্বিকার ভঙ্গিতে, বিক্রি করে দিছি।

রুনা আমাকে একটা মোবাইল ফোন উপহার দেয়। তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে নিয়মিত কার্ডও কিনে দিতে থাকে।

সেই মোবাইল সেটটাও বিক্রি করে দিতে আমি বাধ্য হই।

এর মধ্যে এসএসসি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে আমার দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছোট বোনটা ভিকারুননিসা কলেজে ভর্তি হতে সমর্থ হয়।

তার ভর্তির খরচও, এখান থেকে ওখান থেকে ধারকর্জ করে আমাকেই জোগাড় করতে হয়।

ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তি পাই। সেই টাকাটা আমাকে ব্যয় করতে হয় দাতব্য কাজে।

হেলাল নামের একটা ছেলে ঢাকা কলেজে পড়ে। প্রতিবন্ধী। কিন্তু বড়ই অভাগা সে। তার বাবা বেঁচে নাই। গরিব মা গ্রামে থাকেন এবং অন্যের বাড়িতে কাজ করে খান।

হেলালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ব্লাইন্ডদের একটা এনজিওর অনুষ্ঠানে।

এনজিওটি মেধাবী অন্ধ গরিব ছেলেদের বৃত্তি দিবে বলে পেপারে বিজ্ঞাপন দেয়। আমরা সেটা জেনে গিয়ে দরখাস্ত করি। আমার নামেও একটা বৃত্তি মঞ্জুর হয়। মাসে ২৫০ টাকা। তিন মাস পরপর সেই টাকাটা আমাদেরকে দেওয়া হয়। সাড়ে সাত শ টাকা একসঙ্গে। সেটা দেবার জন্যে প্রত্যেকবার একটা অনুষ্ঠান হয়। তাতে একবার ইত্তেফাক সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, আরেকবার মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হন।

আমরা তাদের হাত থেকে চেক নিতেছি, ছবি পরের দিনের কাগজে ছাপা হয়।

হেলালও আমার মতো এই বৃত্তি পাইছে। প্রত্যেক তিন মাস পরে ওর সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে দেখা হতে থাকলে একসময় আলাপ-পরিচয় হয়।

তার জীবনের করুণ কাহিনী শুনে আমি আমার জীবনের করুণ কাহিনী ভুলে যাই।

ঢাকা কলেজের হোস্টেলে ও না খেয়ে আছে, ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের ফরমও ফিলআপ করার টাকা জোগাড় করতে

পারতেছে না, এইসব শুনে আমার মনটা নরম হয়ে যায়।
আমি আমার ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাপ্ত বৃত্তির টাকাটা তার হাতে তুলে দেই।
ও বলে, আপনার কী হবে?
আরে মিয়া, আজকার সমস্যার সমাধান তো করো। আমার তো আজকা চলার মতো টাকা আছে। কালকার চিন্তা কালকা করা যাবে।

২৯.

তবু আমি যাই রুনার কাছে। তার কণ্ঠ, তার কথা, তার হাতের সামান্য ছোঁয়াও আমাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে।
মিরপুরে গেলে গিয়াস মামার দোকানেই বসি। মিসকল দিলেই খানিক পরে রুনা হাজির হয়।
একদিন এমনি অপেক্ষা করতেছি একই দোকানে, হঠাৎ কয়েকটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর আমাকে ঘিরে ধরে।
তারা আমাকে বলে, এই বেটা, আমাগো পাড়ায় রোজ কী রে তোর?
আমি বলি, না কিছু না।
না কিছু না। রুনা আহে না তোর কাছে। একটু পর যাইবি না হের লগে?
আমি বলি, সেটা তো আমাদের ব্যাপার। আপনাদের কী?
ওরা খেকিয়ে ওঠে কুকুরের মতো। আমগো কী মানে? রুনার গার্জিয়ান আমাগো কাছে কমপ্লেইন দিছে। আর কুনোদিন যদি দেখছি রুনার লগে তরে, হালার পো হালা কানার দুই হাত পা কাইটা লইয়া কুত্তা দিয়া কাটামু।
আমি ভয় পাই না। ঠাণ্ডা মাথায় বলি, এসব কথা আপনারা আমাকে বলছেন কেন? রুনাকে বলেন, ও যেন আর আমার কাছে না আসে।
মাস্তানগুলো চলে যায়।
রুনা আসলে আমি রুনার সঙ্গে রিকশায় উঠে একদিকে চলে যাই। রুনাকে বলি, কী ব্যাপার বলো তো। ওরা এই রকম করল কেন?
বাদ দেও। সব ফেনসিডিলখোর। কী বলল না বলল, কিচ্ছু যায়-আসে না।
সত্যি যায়-আসত না। আমি এইসব কথা, ধমক, হুমকিকে পরোয়া করতাম না। যদি...
কিন্তু ওরা কয়েক দিন পর আবার আসে।
ওই একই গিয়াস মামার দোকানে।
ওই হারামজাদা, তুই আবার আইছস। তরে কইছি না, আর আইবি না। ওরা আমাকে টেনেহিঁচড়ে দোকানের বাইরে নেয়।
বেধড়ক কিল-ঘুষি মারতে থাকে।
আমি মাটিতে লুটায়া পড়ি। আর চিৎকার করতে থাকি। গিয়াস মামা দোকানে ছিলেন না। তার দোকানের কর্মচারী তাকে ফোন করলে তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন এবং আমাকে রক্তাক্ত ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় উদ্ধার করেন।
আমি দোকানে থেকে হলে ফিরে আসি।
মোবাইলে ফোন দেওয়ার চেষ্টা করি রুনাকে। সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করে নারীকণ্ঠ আমাকে অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করতে বলে।
আমি বারবার চেষ্টা করেই যাই। কিন্তু রুনাকে আর ধরতে পারি না।
শেষে আমি তার টিঅ্যান্ডটির নাম্বারে চেষ্টা করি। অন্য কণ্ঠস্বর ভেসে আসে টেলিফোনের ওপার থেকে। আমি রুনাকে চাইলে অপরপক্ষ আমার পরিচয় জানতে চায়। আমি পরিচয় দিলে ফোনটা কেটে দেওয়া হয়।
আমি ফোন করতেই থাকি। করতেই থাকি।
একবার আমি রুনাকে পেয়ে যাই টিঅ্যান্ডটির ফোনে। রুনা তোমার কী হইছে বলো, তুমি আমার ফোন ধরতেছ না কেন?
রুনা বলে, আমাকে তুমি ভুলে যাও আজাদ।
এইটা তুমি কী বলতেছ?
হ্যাঁ। এইটা আমি অনেক ভেবে বলতেছি। যা হওয়ার নয়, সেইটা নিয়া...না তুমি আমাকে ভুলে যাও। আর কোনো দিনও ফোন করবা না। বুঝলা...
আমার সমস্ত অস্তিত্ব দুলে ওঠে। আমার জগৎ-সংসার অর্থহীন বলে মনে হইতে থাকে।

আমি তাকে বলি, কালকে সকালে তুমি আমাকে হয় ফোন দিবা, না হলে চলে আসবা, না হলে মনে রাখবা আমাকে আর কখনো দেখবা না।

পরের দিন সারা সকাল আমি অপেক্ষা করি। আমার হাতে মোবাইল ফোন।

না, ফোন আসে না।

সেও আসে না।

আমি রুম থেকে বার হয়ে যাই। আমার কাছে একটা পুরানা প্রেসক্রিপশন ছিল। ছোটবেলায় ভাগ্নে বাবু আমার নাকে উড়ন্ত লাথি মেরে নাক ফাটায়ে ফেলছিল। রক্তে আম্মার শাড়ি পুরাটা ভিজে গেছল। তারপর থেকে মাথাব্যথা করত খুব। দিনের পর দিন প্রচণ্ড মাথাব্যথা। সেও আদমজী পাটকলের ভিতরে থাকার সময়েরই ঘটনা। আব্বা আমাকে স্থানীয় একটা ক্লিনিকে নিয়া যাইতেন। প্রথমে ডাক্তার ওষুধপত্র দেন। সেসব খেয়ে মাথাব্যথা কমে না। শেষে নাকের এক্স-রে করে দেখা যায়, ভিতরে সমস্যা আছে। অপারেশন করতে হবে। আমাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। আম্মা আমার পাশের বেডে থাকেন। বড়পা দুই বেলা আমার জন্যে খাবার আনেন। আমাকে ওটিতে নেওয়া হয় (তাই নেবার কথা বলে বলতেছি)। ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোন ক্লাসে পড়। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি ক্লাসে ফার্স্ট হও নাকি। বলতে বলতেই আমার নাকে কী একটা ধরেন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তিন ঘণ্টা অপারেশন হয়। যখন জ্ঞান ফেরে তখন প্রচণ্ড ব্যথায় আমি চিৎকার দিয়া পুরা হাসপাতাল মাথায় তুলে ফেলি। আমাকে আবার অজ্ঞান করা হয়। এরপর আমাকে ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দেন কিছুদিনের জন্যে। সেই প্রেসক্রিপশনটা আমার সঙ্গে রয়ে গেছল।

সেইটা আমার সঙ্গে করে নিয়া আমি বার হইছি।

আমি ওষুধের দোকানে গিয়ে বলি, ভাই, আমার তো চলাফেরার অসুবিধা, একবারে ২০টা ট্যাবলেট দিয়া দেন। তাইলে আমার ঝামেলা কম হয়। দোকানি দয়াপরবশ হয়ে ২০টা ট্যাবলেটই আমার কাছে বিক্রি করে ধন্যবাদার্হ হয়। আমি রুমে ফিরে আসার পর আমার মোবাইলে একটা টেক্সট মেসেজ আসে। ফরগেট মি ফর এভার। এটা আবার আরেক নাম্বার থেকে আসে। আমি রিং ব্যাক করার চেষ্টা করি কিন্তু সেটটা বন্ধ পাই।

আমি আমার রুমমেট আনোয়ার ভাইকে বলি, রাতে খিচুরি আর গোরুর মাংস করেন। আমি খাব।

উনি দারুণ রাঁধতে পারেন।

আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে তিনি বাজারে যান। চাল-ডাল-মাংস কিনে এনে রাঁধতে আরম্ভ করেন।

আমি তাকে বলি, এইটাই আমার জীবনের শেষ খাওয়া হইতে পারে। উনি হাসেন। বলেন, তাহলে কাল সকালে রুম ঝাড়ু দেবে কে?

আমি রোজ সকালে রুমটা ঝাড়ু দিতাম।

রাতের বেলা খাওয়া খুব ভালো হয়। আনোয়ার ভাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রান্নাটা রাঁধেন এবং আমিও জীবনের তরে লাস্ট সাপার করে ফেলি।

খাওয়াদাওয়া শেষে ওনারা আমাকে বিছানায় শোয়ায়া দিয়া পাহারা দিয়া রাখেন। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলে ওরাও একসময় ঘুমায়া পড়েন। ঘুমানোর আগে তারা রুম থেকে গেলাস-ফেলাস সব সরায়া ফেলেন। কী জানি পাগলাটা যদি আবার সত্যি ঘুমের ওষুধ-টষুদ খায়।

রাত চারটায় আমি বিছানা ছাড়ি।

ট্যাবলেটগুলো নিয়া বাথরুমে যাই। ট্যাপের পানি হাতে নিয়া কুড়িটা ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমায়া পড়ি।

৩০.

ওই নিদ্রা চিরনিদ্রা হতে পারত।

রুমমেটদের মধ্যে রফিকুল ভাই রোজ ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়েন। সাড়ে চারটায় উঠে উনি আমাকে আবিষ্কার করেন মেঝেতে। এই মেঝেতে আমি কীভাবে গেলাম আমি জানি না। তবে ওই মেঝেতে অবতরণই আমাকে বাঁচায়া দেয়।

তারা বুঝতে পারেন অকাম যা করার আমি করেছি। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। আমার পাকস্থলী ওয়াশ করা হয়।

এসব আমি পরে রুমমেটদের কাছে শুনছি।

এও শুনছি, আমার পকেটে আড়াইশ টাকা ও প্রেসক্রিপশন পাওয়া যায়, ওই টাকাটা খরচ করা হয়ে গেছে এরই মধ্যে। আমাকে হাসপাতালের মেঝেতে ঠাঁই দেওয়া হইছিল। আনোয়ার ভাইরা বলছেন, জানেন, ওকে দেখতে একটু পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচাররা আসবেন, কী করছেন, ওকে বেড়ে তোলেন।

৪৮ ঘণ্টা অচেতন থাকার পর আমার জ্ঞান আসে।

আমি তখন হাসপাতালের বিছানায় শোওয়া। কোন হাসপাতাল, আদৌ হাসপাতাল কি না, আমি জানি না। আমার জানার কথা নয়।

আমি আহ্-উহ্ করতে শুরু করি।

তখন আমি আমার কপালে একটা হাতের স্পর্শ পাই। এই স্পর্শ ও গন্ধ আমার কাছে চেনা মনে হয়। আমার আম্মা।

আম্মা বলেন, বাবা...

আমি অস্ফুট স্বরে বলি, আম্মা।

আম্মা কাঁদেন। তার তপ্ত অশ্রু আমার মুখমণ্ডলে এসে পড়ে।

আমি আরও খানিকটা সুস্থ হলে আম্মা আমার হাত ধরেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তুমি আমার একমাত্র ছেলে। আমার চারটা মেয়ে, আর মাত্র একটা ছেলে। আমার পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনটা চোখে দেখে না। তুমিও দেখো না, কিন্তু আমি চাইছিলাম তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াও, লেখাপড়া শেখো, শিইখা মানুষের মতো মানুষ হও। এইটা দেখতে পারলেই আমি শান্তিতে চোখ বন্ধ করতে পারব। সেই জন্যে তোমাকে কত কষ্ট কইরা লেখাপড়া করাইতেছি। তুমিও কত কষ্ট করছ। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পইড়া আবার নার্সারি থাইকা শুরু করছ। ব্রেইলে লেখতে শিখছ। পড়তে শিখছ। কত মাইর খাইছ। কত কান্নাকাটি করছ। আর আমিও তোমার জন্যে কী করি নাই। কতবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেছি। তোমার কলেজে রোজ তোমারে লইয়া গেছি। সারা দিন আমি কই কই থাকতাম, তুমি জানো? একেক দিন ফকিরের মতো কলোনির লোকরা আমারে তাড়ায়া দিত, আমি একটু নামাজের জায়গা পাইতাম না! তোমার জন্য তোমার বড় আপা কত কষ্ট করছে। রুজি কত কষ্ট করছে। কত ক্যাসেট কইরা দিছে। কত পড়া তোমারে পইড়া শুনাইছে। আজকা আমাদের অবস্থা খারাপ। তোমার আব্বা টাকার শোকে পাগলপ্রায়। স্ট্রোক কইরা আমার শরীলের একটা পাশ অবশ। আর আইজকা তুমি একটা মেয়েমানুষের জন্যে ঘুমের ওষুধ খাও! একবার ভাবলা না তোমার পিছনে আমাদের কষ্ট আছে। একবার ভাবলা না তুমি মারা গেলে আমাদের এত দিনের কষ্ট এতজনের এত পরিশ্রম এই সব কোথায় যাইব? তোমার ছোট বোন রত্না চোখে দেখে না। তার পড়ার খরচ। আমাদের কত দিন এখন ভাত রান্নার চাউল থাকে না! এইসব জানো তুমি! আর তুমি তোমার জীবনটাকে এইভাবে ছেলেখেলা মনে কর? তোমার জীবন তোমার একলার জীবন?

আমি সব বুঝতে পারি! উপলব্ধি করতে থাকি, কত বড় ভুল আমি করতে বসছিলাম! বুঝতে পারি, সত্য তো, এই জীবন তো আমার একলার নয়। যে দেশ আমাকে তার ভূমি দিছে ভূমিষ্ঠ হবার জন্যে, তারও কিছু ভাগ আছে এই শরীরে! যে মা আমাকে গর্ভে ধারণ করছেন, তার নিজের রক্ত দিয়া আমার শরীরটাকে বড় করে তুলছিলেন, আমাকে দুধ খাওয়াইছেন, তারও কিছু ভাগ আছে এই জীবনে! যে বোনেরা আমার জন্যে দিন-রাত পরিশ্রম করছে, আমাকে মমতা দিয়া তিল তিল করে বড় করে তুলছে, তারাও তো এই জীবনের একাংশের মালিক। আমার শিক্ষকেরা, আমার বন্ধুরা! আমি তো তাদের আশা-ভরসা মাটির সঙ্গে মিশায়া দিতে পারি না। আমাকে নিয়ে ধরা বাজিতে তাদের হারায়া দিতে পারি না।

আমি আম্মাকে বলি, আম্মা ভুল হয়ে গেছে। আর এই ভুল আমি জীবনে করব না।

আম্মা বলেন, না, তুমি আমার সাথে ওয়াদা করো, আমার মাথায় হাত দাও, হ্যাঁ এখন ওয়াদা করো, আর কোনো দিন তুমি ছাত্র অবস্থায় প্রেম করবা না, কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়াইবা না।

আমি আম্মার মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করি, আম্মার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করি।

আম্মা আমাকে হলের রুমে রেখে যান। প্রভোস্ট স্যার আসেন। তিনি মহা খাপ্পা। বলেন, আমি ওর জিনিসপত্র সার্চ করব। কোনো কিছু পেলে সেটা বাজেয়াপ্ত করব।

তিনি আমার ট্রাংক সুটকেস লকারের জিনিসপত্র ঘেঁটে প্রেসক্রিপশনটা উদ্ধার করেন এবং সেটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যান।

৩১.

হলে কী নিয়া যেন গণ্ডগোল লাগছে। লুঙ্গি চুরির দায়ে একজন অতিথিকে নাকি শাস্তি দেওয়া হবে। ওদিকে গেস্ট তার

হোস্ট হিসাবে যার নাম বলতেছে, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা।
তার গেস্টের গায়ে কে হাত দিবে?
আমাদের সময়ে হলের পরিবেশ মোটামুটি শান্তই থাকে বলা যায়। আগে নাকি এইসব হলকে বলা হতো ক্যান্টনমেন্ট। এত অস্ত্র নাকি হলে থাকত। মাঝেমধ্যে হলের দখল নিয়া বন্দুকযুদ্ধ শুরু হইত। সেইসব এখন হয় না। হলের প্রধান অশান্তির কারণ ছারপোকা। প্রত্যেকটা বেডে ছারপোকা। ছারপোকার কামড়ের অত্যাচারে আগে ঘুম আসত না। এখন এটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। খা বেটারা কত খাবি।
আরেকটা অশান্তি হলো ক্যান্টিনের খাবারের নিম্ন মান। ডালটা সত্যিকারের ডুবুরি নামার মতো পাতলা।
আমাদের রুমেও আজকে একজন গেস্ট আসছেন। রফিক ভাইয়ের কেমন বড় ভাই হন। আমরা তাকে নিয়া চিন্তিত আছি। চোর ধরার নাম করে আবার তাকে ধরে নিয়া ধোলাই দেওয়া হবে না তো!
এই গেস্টের নাম মোশাররফ। তিনি সারাক্ষণ প্রশ্ন করেন। যেমন তিনি প্রশ্ন করেছেন, লুঙ্গির ইংরাজি কী? আমরা কেউই লুঙ্গির ইংরাজি জানি না।
আমি বললাম, লুঙ্গির ইংরাজি লুঙ্গি হিসাবেই লিখতে হবে। এখন দুনিয়াতে ইংরাজি সাহিত্য রচনার এটা একটা ফ্যাশন চলতেছে। লুঙ্গিকে লুঙ্গি লিখলে বাংলারও লাভ, ইংরাজিরও লাভ।
আচ্ছা, বলো তো, তোমাদের মুহসিন হলের সামনে একটা গেট দেখলাম–রাউফুন বসুনিয়া গেট। এটার নাম রাউফুন বসুনিয়া গেট হলো কেন?
এইটার উত্তর আমার জানা নাই। তবে রাসেলকে ফোন করে জেনে নেওয়া যায়। রাসেল আমাদের সহপাঠী, আবার একটা কাগজের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি।
আমি তাকে মামুনের মোবাইল থেকে ফোন দেই। রাসেল, বলো তো, রাউফুন বসুনিয়া গেটের নামকরণ কেন হলো? রাসেল বলে, আমি তো জানি না। দাঁড়াও, জেনে জানাচ্ছি।
রাসেল ফোন করে ১৫ মিনিট পরে। তার কাছ থেকে জানা যায়, এরশাদবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় এলাকায় ছাত্রদের মিছিলে এরশাদের অনুগত ছাত্রগুণ্ডারা গুলিবর্ষণ করে। তখন রাউফুন বসুনিয়া নামে একজন ছাত্রনেতা মারা যান। তারই নামানুসারে এই তোরণের নাম রাউফুন বসুনিয়া তোরণ হয়।
মোশারফ ভাই বলেন, কত সালের ঘটনা।
আমি তো সেটা শুনি নাই।
এমন সময় মামুনের মোবাইলে একটা ফোন আসে। এবং আমাকে চাওয়া হয়।
হ্যালো, আজাদ বলছেন? (নারীকণ্ঠ)
জি। বলছি।
নিন, কথা বলুন।
হ্যালো আজাদ, কেমন আছিস?
শিমুলের গলা। ওই যে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার সময় যে দুজন ভিকারুননিসার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের একজন।
আমি বলি ভালো।
এই শুন...শিমুলের কিছু জরুরি কথা ছিল, সে সেসব সেরে নিলে আমি বলি, এই ফোনটা প্রথমে কে করছিল, ভারি মিষ্টি তো গলাটা।
আমার আন্টি, শিমুল বলে। কথা বলবি। নে। কথা বল।
হ্যালো...আন্টির গলা। মনে হলো বসন্তকালের শিমুলের ডালে কোকিল ডেকে উঠল।
আমি বলি, হ্যালো স্লামালেকুম। আন্টি আপনি ভালো আছেন।
হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন।
আছি। আন্টি আপনার ভয়েসটা খুব সুন্দর লাগল তো। তাই কথা বলছি। আপনি কিছু মনে করেননি তো!
না মনে করব কী? আমি আপনার কথা শিমুল-বকুলের মুখে অনেক শুনেছি।
কী শুনেছেন?
এই যে আপনার কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর, আপনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে এইসব।
আরে, ওরা বাড়িয়ে বলেছে।
আপনি দেখতেও নাকি খুব সুন্দর।

কী বলেন? ছেলেদের আবার সুন্দরটুন্দর কী?
না, ওরা বলল, আপনি নাকি দেখতে লিটু আনামের মতো!
লিটু আনাম কে? টেলিভিশনে নাটক করে?
হ্যাঁ।
সে দেখতে কেমন? কৌতুকাভিনেতা নয়তো?
আরে না। রীতিমতো নায়ক। ইন্ডিয়াতে গিয়ে ইন্দ্রানী হালদারের বিপরীতে সিনেমা পর্যন্ত করে এসেছে!
হা হা হা। আমার সঙ্গে তার তুলনা! আন্টি আপনার নাম কী?
কাকলি।
এত সুন্দর একটা নাম!
এই, আপনি এত মেয়ে-পটানো কথা বলেন কেন?
কী রকম?
এই যে আপনার ভয়েসটা সুন্দর, আপনার নামটা সুন্দর?
আচ্ছা যান। আপনার ভয়েসটা কাকের মতো। আর নামটা কী বলব। এই নাম আপনি এফিডেভিট করে চেঞ্জ করেন।
চেঞ্জ করে কী রাখব?
রাখেন খাদেমুন্নেসা!
খাদেমুন্নেসা...হি হি হি...খাদেমুন্নেসা খারাপ কী?
আরও খানিকক্ষণ কথা হয়। আমি বলি, আন্টি, আপনার বিল উঠছে। আমি রাখি।
উঠুক। অসুবিধা নাই।
এই রকম কথা হয়। খানিকক্ষণ। তারপর আন্টি ফোন রেখে দেন।
কিন্তু আন্টি মাঝেমধ্যেই ফোন করেন। আমরা কথা বলি। আমরা যে কথা বলি, সেটা অবশ্য শিমুল-বকুল জানে না।
একদিন শিমুলই ফোন করে বলল, তারা চারুকলা ইনস্টিটিউটে আসছে। তাদের একটা ভাগ্নে ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল, আজ তার পুরস্কার বিতরণ, চারুকলায়। ওরা বলল, তুইও চলে আয় আজাদ।
আমি যাই। ওরা এসে বলে, এই যে আজাদ, তুই এসে গেছিস। কতক্ষণ?
আমি একটু আগেভাগেই এসে পড়ছি।
বকুল বলে, বল দেখি আমাদের সঙ্গে কে?
কে?
তুই বল।
ভাই, আপনি কে?
আপনিই বলেন।
কণ্ঠস্বর শুনেই আমি বুঝে ফেলি এ হলো কাকলি। মুখে বলি, আন্টি।
কী করে চিনলি?
আমি কারও গলা একবার শুনলে জীবনেও ভুলি না। চোখ নাই তো। আমাকে তো কান দিয়ে দেখতে হয়।
অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরি হইতেছে।
আমরা চারুকলার বারান্দায় বসে শীতবিকালের রোদ পোহাচ্ছি। আরামই লাগছে। আন্টির কণ্ঠস্বরটা আসলেই মধুর। আর সবচেয়ে ভালো তার হাসি। কথায় কথায় হাসেন।
আমরা ফ্লাস্কের চা খাই। গল্প করি। শিমুল-বকুলের ভাগ্নে মনন অস্থির হয়ে ওঠে, খামণি, কখন শুরু হবে অনুষ্ঠান, কখন!

রাতের বেলা মামুনের মোবাইলে কল আসে। আন্টিই করেছেন। বলেন, আপনি তো দেখতে আসলেই সুন্দর।
সুন্দর বইলেন না তো। ছেলেদের সুন্দর বললে কেমন সুন্দর গাধা সুন্দর গাধা শোনা যায়।
হি হি হি। আচ্ছা আমাকে কেমন দেখলেন?
সুন্দর। খুব সুন্দর।
আমি কিন্তু শাড়ি পরে গেছলাম।
তাই নাকি? কী রঙের শাড়ি!

এই তো, শাদার ওপরে চকলেট আর ইয়েলোর ব্লক। সুন্দর আছে শাড়িটা! এই শুনেন। আজকে তো শিমুল-বকুল ছিল। বেশি গল্প করতে পারলাম না। কালকে আপনার হলে আসি। আপনি কী খেতে পছন্দ করেন। আপনাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াই।
কালকে। না বাবা। কাল থেকে আমার পরীক্ষা শুরু। আমার একদম বের হওয়া চলবে না। আমার রেজাল্ট তো ভালো করতেই হবে। তাই না?
তা অবশ্য ঠিক। তাহলে পরীক্ষা শেষ হলে দুইজনে অনেক ঘুরব। আচ্ছা!
আরে আন্টি, আমার সঙ্গে কী ঘুরবেন।
নৌকায় ঘুরব। আপনি অনেক মজা পাবেন।
না না, নৌকা আমার খুব ভয় লাগে। সাঁতার জানি না তো।
এই একটু রাখেন। আমি আবার ফোন দিচ্ছি।
বাপরে, আবার ফোন দেবে। আমি ফোন কেটে দেই।
আমাদের হলে, অন্যদের মুখে শুনে ও শব্দ বিচার করে আমি যা বুঝি, রাত ১২টার পরে শুরু হয়ে যায় মোবাইলে কথা বলার উৎসব। এখানে ওখানে, এ বারান্দায় ও বারান্দায় ছেলেরা সব কানে মোবাইল নিয়ে ফিসির-ফিসির ফুসুর-ফুসুর করতে থাকে। সবাই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। এ এক অন্য রকম ব্যাপার। হয়তো আগের প্রজন্মের হলবাসীরা এই দৃশ্য কল্পনাও করতে পারবে না।
আমারও ছিল একদিন কথা বলার লোক।
এখন নাই।
ছাত্র আছি যত দিন তত দিন আর হবে না!
আম্মার মাথা ছুঁয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে!

৩২.
আমি আর আমার রুমমেট ফার্স্ট ইয়ারের মামুনকে নিয়ে গেছি ওর এক খালার বাসায়।
মামুনের খালারা বিদেশ গেছেন কদিনের জন্যে। আমাদের কাজ বাসা পাহারা দিয়ে রাখা। বাসায় গাছ আছে, সেসবে পানি দেওয়া। একটা টিয়াপাখি আছে, তাকে খাবার দেওয়া।
ফোন এলে বলে দেওয়া ওরা বাড়িতে নাই। আর অন্য কেউ এলে দরজা খোলা নিষেধ।
মামুনের মোবাইলে কল আসে।
আমার কল। মামুন আমাকে এগিয়ে দেয় তার সেটটা।
হ্যালো...
আন্টি!
আন্টি আন্টি শুনতে ভালো লাগে না। আমার নাম ধরে ডাকতে পারেন না!
কাকলি। খুব পচা নাম। খাদেমুন্নেসা হলে ভালো হতো।
হা হা হা। সব মনে আছে দেখছি। অবশ্য বকুল-শিমুলের কাছে শুনেছি, আপনি খুব ভালো ছাত্র। আপনার ব্রেন খুব শার্প।
বকুল-শিমুল সব সময় আমার কথা বাড়িয়ে বলে।
এই আপনি এখন কোথায়।
আমি? আমার রুমমেট মামুনের খালার বাসায়। খালারা কেউ বাসায় নাই। তাই বাসা পাহারা দিতে এসেছি।
ল্যান্ডফোন নাই।
আছে তো একটা।
নাম্বার বলেন না!
নাম্বার তো আমার জানা নাই।
আচ্ছা আমার মোবাইলে ফোন দেন। তাইলে আমি জেনে যাব নাম্বারটা।
আপনার নাম্বারটা বলেন।
আমার নাম্বার তো আপনার মোবাইলে উঠেছে।
মামুন তো বাথরুমে। আমি তো নাম্বার পড়তে পারব না।

ও। স্যরি, স্যরি। নেন, লিখে নেন।

লিখে নিলেও লাভ নাই। মনে রাখতে হবে। আপনি বলেন।

আন্টি নাম্বার বলে। আমি তাকে টিঅ্যান্ডটি থেকে কল দেই। উনি ধরে বলেন, আজাদ?

জি।

ঠিক আছে। পাইছি। আপনি রাখেন আমি কল দিচ্ছি।

আন্টি কল দেন। ও তাকে আবার আন্টি বলা যাবে না। কাকলি। আচ্ছা তাই সই। কাকলি।

কাকলি ফোন করেন। আমি কথা বলি। অর্থহীন কথা সব। কোনো মানে হয় না সেইসব কথার। উনি কোথায় পড়েন, কীভাবে ক্লাসে যান, ওনার দুলাভাই কীভাবে ওজন কমানোর জন্যে ডায়েটিং করে শুধু আপেল আর শশা খেয়ে থাকেন আর দুদিন পরেই কাচ্চি বিরিয়ানি কিনে এনে খান, আড়ংয়ে মূল্য হ্রাস দিয়েছে, মুভ অ্যান্ড পিকের আইসক্রিম ভালো, শহিদ আফ্রিদি খুব সুন্দর দেখতে, না, তার চেয়ে যুবরাজ ভালো, মৌসুমী ভৌমিকেও ওই গানটা খুব ভালো, আমি শুনেছি সেদিন তুমি নোনা বালুতীর ধরে নীলজল দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছ...এইসব...অবান্তর কথা...অপ্রয়োজনীয় কথা...কিন্তু কথা...কথার পিঠে কথা...মাঝেমধ্যে মনে হয়, যদি আল্লাহ আমাকে বলতেন, দৃষ্টি আর বাকশক্তির যেকোনো একটা কেড়ে নেওয়া হবে, আমার ইচ্ছা, আমি মনে হয় সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না, কোনটা ছেড়ে দিয়ে কোনটা আমি চাই...

পরের দিন আবার ফোন।

কাকলিই করে। আমি ধরি। কথা বলি। আন্টি মানুষ। কথা বলতে অসুবিধা কী?

পরের রাতে আবার ফোন।

ল্যান্ডফোন থেকে ল্যান্ডফোনে।

কাকলিই করেছে।

অনেক রাত। চারদিক নিস্তব্ধ।

আজ যে তার কী হয়েছে।

সে বলে, আজাদ, তুমি না ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়ো, লেখো।

হ্যাঁ।

সেটা কী রকম?

কাগজের পৃষ্ঠায় ডট খোদাই করা থাকে। ডটের সংখ্যা আর পজিশন আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করে বুঝে নেই আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলি এটা কোন অক্ষর।

আচ্ছা এইভাবে কি তুমি একটা গোটা উপন্যাস পড়ে ফেলতে পারবে?

পারব। যদি ব্রেইলে লেখা থাকে।

তাহলে তুমি আমাকে পড়তে পারবে না!

সেটা কী রকম?

ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়বে আমাকে। আমার নাকে স্পর্শ বুলাবে, চোখে স্পর্শ বুলাবে। আমার কানে। আমার ঠোঁটে। আমার চুলে। তারপর পড়ে ফেলবে আমাকে। চিনে ফেলবে আমাকে। এরপর আমি যদি কথা বলতে নাও পারি, আমাকে স্পর্শ করে করে আমাকে চিনবে। তার কণ্ঠ ঘন হয়ে আসে।

আমি বলি, পারব। নাকমুখ স্পর্শ করে মুখস্থ করব। তা ছাড়া ঘ্রাণ। ঘ্রাণেও মানুষ চেনা যায়।

এই, আমি তোমার কাছে চলে আসি। আজ রাতেই আসি। তুমি আমাকে পড়ো।

যা!

শোনো, তুমি আমাকে পড়বে। আমার নাক পড়বে। মুখ পড়বে। আমার ঠোঁট। আমার কান। আমার গলা। আমার ঘাড়। আমার বুক। দুটো বুক অনেকক্ষণ ধরে বুলাবে। অনেকক্ষণ। যেন এর পরের বার যখন যাব, শুধু আমার বুক টাচ করেই তুমি বলে দিতে পার, আমি কে?

আমার শরীর উষ্ণ হতে থাকে। আমার নেশা নেশা লাগে। আমার মনে হয় আরো শুনি। কিন্তু আমার মনে পড়ে যায় আমার আম্মার সঙ্গে আমার প্রতিজ্ঞার কথা। আমি নিজেকে দমন করি। আমি বলি, আপনি আমার আন্টি। আপনি এইসব কী বলছেন।

আবার আন্টি। আমি তোমার কেমন আন্টি। শিমুল-বকুল তোমার কে হয়! কেউ না। আমিও তোমার আন্টি হই না।

আমি তোমার কাকলি হই। শোনো, আমি সব কাপড়চোপড় ছেড়ে তোমার সামনে দাঁড়াব। তুমি তোমার সমস্ত শরীর দিয়ে আমাকে পড়বা। আমি কালকে সকাল ১০টার মধ্যে তোমার কাছে চলে আসব। তুমি ঠিকানা বলো।
আমি ফোন কেটে দেই।
আবার ফোন বাজে।
আমি ফোন কেটে দিয়ে সেট তুলে রাখি।
মামুনের ঘরে মোবাইল বাজে। আচ্ছা পাগল তো এই মহিলা।

৩৩.
মান্টি আবার ফোন করছে। আমি ধরতেছি না। আমার এলোমেলো লাগতেছে নিজেকে। আমি আমার আম্মার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি আর কোনো নারীর সঙ্গে জড়াব না। এই কোন ছলনার জাল আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ায়া ধরতেছে। আমার কিছু ভালো লাগে না। আমার পেটব্যথা করতে শুরু করে। বমি বমি লাগে।
আমার মাথার ভেতরে সাইরেন বাজতে থাকে। আমার শৈশবের সেই আদমজীর সাইরেন। মিল চলার অবিরাম যন্ত্রধ্বনি আমার দুই কান জুড়ে বাজতে থাকে।
সপ্তাহখানেক পরে কাকলির ফোন আসে। মামুনের মোবাইলেই। এর মধ্যে সে অবশ্য অনেকগুলো এসএমএস পাঠাইছে। আমি কোনোটার জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করি নাই।
কাকলি বলে, কেমন আছ, আজাদ।
ভালো।
এই কদিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি নাই। কিন্তু এসএমএস তো পাঠিয়েছি, তাই না।
আমি তো বলিনি যে কেন তুমি ফোন করোনি।
শোনো, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি।
এইসব কী বলছেন। না। আমি ভাই প্রতিবন্ধী মানুষ। আমার এইসব ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা সাজে না।
কেন সাজবে না। প্রতিবন্ধী হলেও তুমি তো ভালোবাসতে খুব পারো।
মানে?
তোমার ভালোবাসার ক্ষমতা আছে কি না, আমি একটা টেস্ট করেছি। তাতে তুমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ।
মানে কী?
আমি জানতাম, তুমি ব্রেইল সিস্টেমে পড়ো। তোমার আঙ্গুলেই আমার শরীর...
আমি বলি, কাকলি, তুমি কাজটা ঠিক করোনি। খুব অন্যায় করেছ। অত্যন্ত অন্যায় করেছ।
আমি ফোন কেটে দেই।
কী আশ্চর্য, আমি কাকলির কণ্ঠস্বর ধরতে পারলাম না। ও আমার সঙ্গে এই রকম একটা প্রতারণা করতে পারল।
ও আবার ফোন করে।
আমি বলি, কাকলি, তুমি কণ্ঠ বদলালে কী করে?
ও বলে, আমি তোমার জন্যে সব পারি। সব। আমি তোমাকে পেতে চাই। সারাটা জীবন ভরে পেতে চাই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে সব দেওয়া যায়। তার কাছ থেকে সব নেওয়া যায়।
আমি বলি, তুমি গলা বদলালে কেমন করে, তাই বলো।
কাকলি বলে, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আমার এমনিতেই ঠাণ্ডার ধাত। তোমার সঙ্গে এই খেলাটা খেলব বলে পরপর কয়েকদিন যথেচ্ছ আইসক্রিম খেয়েছি। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে ভিজা গায়ে ফ্যানের নিচে বসে থেকেছি। এই, আবার আসো না গো।
আমি এবার ফোন অফ করে দেই।

৩৪.
আমি ক্লাসে যাইতেছি সকালবেলা।
কেউ একজন এসে আমার হাত ধরে। শরীরের গন্ধেই আমি টের পাই সে কে! কাকলি।
আমি বলি, হাত ছাড়ো। আমি ক্লাসে যাচ্ছি। ক্লাসে আজকে পরীক্ষা আছে।
কিছুক্ষণ ধরে রেখে সে হাত ছেড়ে দেয়।

আমি দ্রুত কলাভবনের দিকে পা বাড়াই।
ক্লাস শেষ করে আমি আর হলে ফিরি না। বলা যায় না, সে যদি হলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে!
আমি বুয়েটে যাই। ওখানে আমার বন্ধু পড়ে আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে। থাকে সোহরাওয়ার্দী হলে।
পরের দিন হলে এসে শুনতে পাই, কাকলি সারাটা দুপুর সারাটা বিকাল হলের গেটের কাছে সিমেন্টের বেঞ্চমতো জায়গাটায় বসে ছিল। সন্ধ্যার পর সে সেই জায়গা ত্যাগ করছে।
একটু পরে রুমে খবর আসে, হলের গেটে সেই মেয়েটা আবার আসছে।
আমি বন্ধুদের দিয়া খবর পাঠাই, গিয়া বলো আমি নাই, আমি গ্রামের বাড়ি চলে গেছি।
খবর পাঠায়াও কোনো লাভ হয় না। সে হলের গেটে এসে বসেই থাকে।
আমি পা টিপে টিপে পালানোর চেষ্টা করি হল থেকে। সে টের পেয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে। বলে, চিনতে পারতেছ?
না পারার কী আছে।
চলো, আজকে আমার সাথে যাবা।
কোথায়?
ভয় পেয়ো না। বাসায় নিয়ে যাব না। মলেই চলো। বসি।
ক্যানো?
তোমার সাথে কথা আছে।
তোমার সাথে আমার কোনো কথা নাই। আমি এখন ক্লাসে যাচ্ছি। তুমি যাও। চলে যাও।
ও কান্দতে থাকে। তুমি চলো আমার সাথে। ১৫ মিনিট। শুধু আমাকে বলো কেন তুমি আমাকে ভালোবাসবা না!
আমি বলি, আচ্ছা চলো। মলে গিয়া বসি।
আমরা গিয়া মলে একটা গাছের নিচে বসি।
কাকলি কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখন তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তুমি তো আমার সাথে ফোনে গল্প কম কর নাই। আমি সুন্দরী। তোমাকে আমি যত ভালোবাসছি, অত ভালো কেউ বাসবে না। কোনো দিনও।
আমি তাকে বলি, আমার একটা অসুবিধা আছে কাকলি।
কী অসুবিধা।
আমি আমার আম্মার মাথা ছুঁয়ে কিরা কাটছি, ছাত্রজীবনে কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো ধরনের রিলেশনে জড়াব না।
তুমি তো রিলেশনে জড়ায়া গেছ। তোমার সাথে তো আমার রিলেশন হয়ে গেছে।
না, হয় নাই।
আচ্ছা, ঠিক আছে হয় নাই। রিলেশন করতে হবে না। তুমি তোমার আম্মাকে দেওয়া কথা রাখো। তাইলে আমাকে কথা দাও, স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করে তুমি আমার কাছে আসবা। আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব।
না। সেটাও এক ধরনের রিলেশনই।
আচ্ছা, তোমাকে কোনো প্রমিজ করতে হবে না। আমি প্রমিজ করতেছি আমি তোমার জন্যে ওয়েট করব। তুমি যেদিন আমার কাছে আসবে সেইদিনই কেবল তোমার সাথে আমার দেখা হবে। এর আগে আমি তোমাকে ফোনও দিব না। চিঠিও লিখব না। যোগাযোগও করব না। কিন্তু আমি তোমারই থাকব। যেদিন তোমার স্টুডেন্ট লাইফ শেষ হবে সেইদিন আমি আসব।
না।
কেন না?
না তো না। তুমি যাও। আমার ক্লাস আছে।
আমি উঠে ক্লাসে চলে যাই। পেছন থেকে আমি শুনতে পাই তার কান্নার শব্দ।

৩৫.

দেশের বাড়ি থেকে খবর আসে। আম্মা পড়ে গিয়া হাত ভাঙছেন। আগেই স্ট্রোক হইছিল, এক পাশটা প্রায় অসাড়ের মতোই হয়ে গেছল, ঢাকায় এনে একবার ডাক্তার আজহারকে দেখায়াও নিয়া গেছি, নিয়মিত ব্যায়াম করে-টরে এখন একটু চালু হইছিলেন, এবার পড়ে গিয়া হাত ভেঙেই ফেললেন।

মোবাইল ফোনে বড়পা খবরটা দেন। আমি বলি, একদম ভাইঙাই গেছে। প্লাস্টার করাইছ।
হ্যাঁ। প্লাস্টার করানো হইছিল। কালকা কবিরাজ প্লাস্টার খুলে তেল মাখায়া দিছে?
আবার কবিরাজ? আমার কেমন যেন লাগে। একটা কবিরাজ আমার চোখটা পুরাপুরি নষ্ট করে দিছল।
'তোমরা যে কবে মানুষ হবা,' বলে আমি রাগ করে ফোন কেটে দেই।
আমি আর পারি না। রুনার দেওয়া এক জোড়া সোনার হাত-বোতাম আমি তুলে রাখছিলাম যত্ন করে, রুনা নাই, তার একটা স্মৃতি হিসাবে একটা কিছু থাকুক ভেবে।
কালকে মেজপার বাসা থেকে খবর আসে, ওরা সারা দিন কিছু খায় নাই। সোনার বোতাম দুটা আমি বিক্রি করে দিছি বায়তুল মোকাররমে গিয়া। দুই হাজার টাকায়।
বাসে করে মেজপার বাসায় গিয়া এক হাজার টাকা দিয়া আসছি।
এক হাজার টাকা আমার কাছে এখনো আছে। চারদিকে দেনাদার, ডাইনিংয়ে বাকি, সাত্তার মিয়ার দোকানে বাকি, লন্ড্রিতে বাকি, যাদের কাছে ধারকর্জ করছি, তারা প্রায়ই আসতেছে রুমে, মাত্র এক হাজার টাকায় কী হবে। ভাবছিলাম, ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার ফরমটা ফিলআপ করব। রেখে দেই।
এখন আবার বড়পার এই ফোন।
কী করি?
আস্তে আস্তে শাহবাগ ডাকঘর যাই। সাত শ টাকা মানি অর্ডার করি বড়পার নামে। তিন শ টাকা থাকুক। টাকা থাকলে বুকে এক ধরনের সাহস থাকে। না থাকলে নিজেকে কুত্তা-বিলাই মনে হয়।
শাহবাগ ডাকঘর থেকে বার হয়ে আর রিকশা নেই না। হেঁটে হেঁটে টিসএসসি যাব বলে ঠিক করি।
একজন বোধ হয় সামনে দঁড়ায়া আছেন। সিগারেট খাচ্ছেন। ধোঁয়া আসছে নাকে। তাকে বলি, আমাকে কি একটু রাস্তাটা পার করে দিবেন?
তিনি বলেন, এক মিনিট সিগারেটটা শেষ করে নেই।
আমি বলি, জি আচ্ছা নেন।
তিনি আমাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেন।
আমি ধন্যবাদ বলে ফুটপাত ধরে হাঁটি।
তিনি বলেন, আপনি কোথায় যাবেন?
আমি বলি, টিএসসি।
তিনি বলেন, আমিও যাব। চলেন, আমার সাথে এক রিকশায় চলেন।
আমি তার সঙ্গে রিকশায় উঠি।
আমি বলি, আপনি কি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট বা টিচার।
তিনি বলেন, না আমি ইউনিভার্সিটির কেউ না। আমি রিপোর্টার। আমি আসছি এইখানে একটা সেমিনার আছে, সেইটা কাভার করতে।
কী সেমিনার? আমি জিজ্ঞাসা করি।
আইএমএফ বিশ্বব্যাংক ও তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য।
আমি বলি, ওরে বাবা। কঠিন সাবজেক্ট।
উনি বলেন, কঠিন। কেন? দারিদ্র্য কী আপনি বোঝেন না?
আমি বলি, বুঝি রে ভাই। আপনার চাইতে সেইটা আমি অনেক ভালো বুঝি। টিএসসি পর্যন্ত হেঁটে আসতে চাইছিলাম, বুঝব না?
তাইলে কঠিন ভাবলেন কেন সাবজেক্টটা।
না, কঠিন না। আমি বলি, আমি কি সেমিনারে যাইতে পারি?
হ্যাঁ, পারেন।
দোতালার সেমিনার কক্ষে সেমিনার শুরু হয়ে গেছে। আমাকে উনি একটা চেয়ারে বসায়া দেন।
আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চলে যাব, মনে মনে ঠিক করি।
একজন বক্তা বলছেন, আইএমএফ বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হবার পর পৃথিবীর যেখানে যেখানে গেছে দারিদ্র্য দূর করতে, কোথাও দারিদ্র্য কমে নাই। উন্নত দেশের তরুণ অভিজ্ঞতাহীন বিশেষজ্ঞরা নতুন নতুন চিন্তা নিয়া এইসব দেশে আসে এবং এক্সপেরিমেন্ট চালায়। যার ফল বেশির ভাগ দেশে বেশির ভাগ সময়ে খারাপ হইছে। ওরা আসলে

ডাক্তার না, কবিরাজ। নানা ধরনের হাতুড়ে চিকিৎসা আমাদের উপরে চালাইতেছে। ওদের নিজেদের দেশে এইসব এক্সপেরিমেন্টের জন্যে ওদের ফাঁসি হয়ে যাইত।

কবিরাজ। আমার চোখ নষ্ট করছে। আম্মার হাতটাও মনে হয় নষ্ট করবে।

অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ আমাদের পরিবারকে পথে বসাইছে। আমাদের পুরা পরিবারকে কানা করে ফেলছে।

আমার মাথা চক্কর দেয়। আমি কান বন্ধ করে বসে থাকি।

আমার গরম গরম লাগে। মনে হয়, বদ্ধ জায়গায় অক্সিজেনের অভাব দেখা দিছে। আমি চুপচাপ উঠে পড়ে নিচে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াই। শীতের বাতাস আমার নাকেমুখে লাগলে কিছুটা ভালো লাগতে শুরু করে।

৩৬.

ধানমণ্ডি মাঠে প্রতিবন্ধী মেলা হইতেছে।

এক করুণ শীতকাতর সন্ধ্যায় আমি আর স্বপন রওনা দেই ধানমণ্ডি মাঠের দিকে।

স্টলের সামনে দিয়া ঘুরি। কোনটা কিসের স্টল বুঝতে পারি না।

আমরা দুজন শেষে মঞ্চের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। মাইকের শব্দ বুঝে বুঝে আমরা হাজির হই মঞ্চের সামনে।

স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের বসতে সাহায্য করলে আমরা তাদের ধন্যবাদ দেই।

অনুষ্ঠানে এখনো বক্তৃতাপর্বই শেষ হয় নাই। একজন সরকারি কর্মকর্তা প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষায় মায়াকান্না কান্দতে শুরু করলে মুখ ফসকে বার হয়, শালা ভণ্ড!

বক্তৃতা শেষে নাটিকা ও সংগীতানুষ্ঠান।

প্রথমে নাটক পরিবেশন করবে প্রতিবন্ধীদের একটি ফাউন্ডেশন।

নাটকটা আমরা শুনে বোঝার চেষ্টা করি। বুঝতে পারি, হুইল চেয়ার বা ক্রাচ নিয়ে যারা চলাচল করে, তারা এই নাটকটা পরিবেশন করতেছেন। তারা সব অফিসে-আদালতে-বাসে-ট্রেনে হুইল চেয়ার নিয়ে যাতায়াতের জন্যে র‍্যাম্প রাখার পক্ষে জোরালো মত তুলে ধরে এই নাটকে।

আসলেই এই দেশটা, এই শহরটা প্রতিবন্ধীদের চলাচলের উপযুক্ত নয়।

ধরা যাক, আন্ডারপাস বা ফুটওভার ব্রিজের কথা। সাধারণ মানুষ আন্ডারপাস বা ফুটওভার ব্রিজ দিয়া রাস্তা পারাপার না করে দৌড়ে যেখানে-সেখানে রাস্তা পার হয়। তাদের ঠেকানোর জন্যে রোড ডিভাইডারের ওপরে তার কাঁটার বেড়া দেওয়া হইছে। কিন্তু একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী কীভাবে হুইল চেয়ার নিয়া ফুটওভার ব্রিজে উঠবে, সেটা কেউ কোনো দিন ভেবে দেখছে কি?

এই রকম বক্তব্যওয়ালা একটা চিঠি আমি পড়েছিলাম ডেইলি স্টারের ওয়েব পেজে। কথাটা আমার মনে ধরছে।

নাটক শেষে গান শুরু হবে। মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়, এবার সংগীত পরিবেশন করবেন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী তসলিমা জাহান।

আমি ও স্বপন পরস্পরের হাতে ধাক্কা দেই।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী কে আবার সংগীত পরিবেশন করতে যাইতেছে।

তসলিমা জাহান গান ধরেন, আমি অপার হয়ে বসে আছি অয়ি দয়াময়, পারে নিয়ে যাও আমায়।

মেয়েটার কণ্ঠস্বর অপূর্ব।

এর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার তো!

গান শেষে মেয়েটি মঞ্চ থেকে নেমে গেলে আমি আমার সামনের জনকে বলি, এক্সকিউজ মি, এখানে কি কোনো ভলান্টিয়ার আছেন।

কেন? বলেন!

যিনি গান গাইলেন, তসলিমা জাহান, তার কাছে কি আমাদের দুইজনকে একটু নিয়ে যাবেন।

আসেন।

তিনি আমাদের হাত ধরে নিয়ে যান মঞ্চের পেছনে (সম্ভবত)।

আপা, এনারা আপনার সাথে দেখা করতে আসছে।

আচ্ছা। বলেন কী ব্যাপার। তসলিমা জাহানের সুরেলা কণ্ঠ গিটারের তারের মতো বেজে ওঠে।

আমি বলি, আমরা দুজন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার গান আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমরা আসলে

অনেক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী স্টুডেন্টের সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত। আপনাকে চিনি না, তাই পরিচিত হতে আসলাম।
আচ্ছা, আচ্ছা, আমার নাম তসলিমা জাহান।
আপনার নাম মাইকে শুনেছি। আমার নাম আজাদ আর ওর নাম স্বপন। আপনি কোথায় আছেন।
আমি ইডেনে পড়ছি।
এর আগে কোথায় পড়ছেন?
মিরপুর ব্যাপ্টিস্ট সংঘ স্কুলে।
ও। তাই নাকি। ওখানে তো আমার বোন পড়ত। আমি বলি।
কী নাম?
রত্না।
ও, আচ্ছা আচ্ছা। চিনছি। এখন বদরুন্নেসায় পড়ে!
রাইট। আমি মাথা নাড়ি।
আপনাকে আমি মনে হয় স্কুলের গেটে দেখছিও।
আপনি কি চোখে দেখেন নাকি!
দেখি, মানে না দেখার মতোই। আমি শর্ট সাইটেড।
আচ্ছা আচ্ছা। আপনার গান খুব ভালো লেগেছে। একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভিজুয়ালি ইমপেয়ার্ডদের অনুষ্ঠানে আসবেন। গান শোনাবেন। আমি বলি।
আচ্ছা আসব। খবর দিয়েন।
আপনার সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় আছে?
আমার তো মোবাইল নাই। আমার রুমমেটের আছে।
আমি বলি, ওই নাম্বারটা দেন। আমিও একটা নাম্বার দিচ্ছি। আমার নিজের মোবাইল নাই। রুমমেটের আছে।
তসলিমা তার রুমমেটের নাম্বার লিখে দেয়। আমার নাম্বারটা লিখে নেয়।
প্রচণ্ড শীতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে আমরা রিকশায় হলে ফিরি।
এসে মামুনের মুখে শুনতে পাই, কাকলি আজকেও আসছিল। অনেকক্ষণ বসে ছিল হলের সামনে।

৩৭.

আরেক দিন। সকালবেলা নাশতা সেরে এসে মামুন বলে, আজাদ ভাই, কাকলি ম্যাডাম তো আজকেও আসছে।
আমি বলি, এখন উপায় কী?
মামুন বলে, জানি না।
আমি বলি, একটা কাজ করি। তসলিমাকে ফোন করে আনি।
মামুন বলে, দেখেন।
তসলিমা এরই মধ্যে রত্নার সঙ্গে আমাদের হলে আসছিল।
ওর সঙ্গে কথা হইছে। ভীষণ দুখী মেয়ে। ওর নিজের মা নাই। সৎমার কাছে অনেক অনাদর-অবহেলা সয়ে মানুষ হইছে। বাবা ঝামেলা এড়াতেই ওকে ভর্তি করে দিছলেন মিরপুরের ওই বোর্ডিং স্কুলে।
এখন বাবাও বেঁচে নাই। অনেক কষ্ট করে ওর দিন যায়।
অথবা যায় না।
তবে ওর একটা সুবিধা আছে, সে খুব অস্পষ্টভাবে হলেও কিছুটা দেখে। অন্তত চলাফেরাটা সে নিজে নিজে করতে পারে।
আজকে কাকলির পাগলামোর অত্যাচারে মনে হলো, তসলিমাই আমার একমাত্র উদ্ধার।
মামুনকে বলি, মামুন, একটু ফোন দিয়ে দাও না তসলিমার নাম্বারে।
মামুন ফোন দেয়।
রিং হতে শুরু করলে সে সেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, রিং হচ্ছে রিং হচ্ছে।
আমি সেটটা কানে দিতেই অপর পার্শ্বে তসলিমার রুমমেটের গলা শোনা যায়, হ্যালো...
আমি বলি, একটু তসলিমাকে দেন না। হ্যালো তসলিমা, একটু আসবা আমাদের হলে। এক্ষুনি।
তসলিমা বড় ভালো মেয়ে। সে সহজেই রাজি হয়ে যায়।

আমি বলি, বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসো। বেশি দেরি কোরো না।
তসলিমা আসে।
মামুন নিচে ছিল, সে তসলিমাকে গেস্টরুমে বসায়া আমাকে খবর দেয়।
আমি নিচে যাই।
তসলিমার পাশে গিয়া বসি।
আমি বলি, তসলিমা, আমাকে একটা বিপদ থেকে বাঁচাও। আমার আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট এটা তোমার কাছে।
তসলিমা বলে, কী বিপদ।
আমি বলি, আরে একটা পাগলি মেয়ে আমার পিছু নিছে। তাকে একটু ছাড়ানো দরকার।
আমাকে কী করতে হবে? তসলিমার কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত শোনায়।
আমি বলি, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার আমিই করতেছি। তুমি শুধু চুপচাপ দেখে যাবা। কোনো কিছুতে বাগড়া দিবা না।
মামুন বাইরে যায় আমার ইঙ্গিত পেয়ে। কাকলি তখনো বসে আছে। মামুন গিয়া বলে, আপনার নাম কাকলি না! আপনি কার জন্যে ওয়েট করতেছেন? আজাদ ভাইয়ের জন্যে? আজাদ ভাই তো বিয়ে করে ফেলছে! একটা অন্ধ মেয়েকে!
(এই রকম বলার কথা। কথার সিরিয়াল কী রকম হইছে, সেটা আমি হুবহু জানি না।)
একটু পরে, যা আশা করছিলাম, তাই ঘটে। কাকলি আসে। আজাদ, তুমি কি সত্যি সত্যি এই মেয়েকে বিয়ে করেছ?
আমি বলি, হ্যাঁ।
কবে?
এই তো দুই দিন আগে।
এই মেয়ে, তোমাকে সত্যি আজাদ বিয়ে করে ফেলেছে?
আমি তাড়াতাড়ি বলি, হ্যাঁ। আমি বললাম, তাতে বিশ্বাস হচ্ছে না। কী তসলিমা হয়নি আমাদের বিয়ে?
তসলিমা অস্ফুট স্বরে বলে, হ্যাঁ। হয়েছে।
সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ে কাকলি। কাঁদতে কাঁদতে একসময় সে চলে যায়।

৩৮.
কাকলি অনেক কান্দছে। শিমুল আর বকুলের কাছে আমি তার কান্নার আরও বর্ণনা শুনছি। শুনে আমারও খুব খারাপ লাগছে। ভেতরে ভেতরে আমিও অনেক কষ্ট পাইছি। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কীই-বা করার ছিল।

হলে শুয়ে আছি কম্বলের নিচে।
হলের বিখ্যাত ছারপোকাগুলো দিনের বেলা বের হয় না। এটা দিনে ঘুমানোর সবচেয়ে উপকারী দিক।
কম্পিউটারে গান বাজছে:
‘ওরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না
শুধু সুখ চলে যায়
ওরা ভুলে যায় কারা ছেড়ে কারা ওরা চায়...’
এমপি থ্রি করা আছে সব গান, হার্ড ডিস্কে। মামুন মনে হয় সিলেক্ট করে এই গানটাই বাজিয়ে দিছে।
ফোন বেজে ওঠে মামুনের মোবাইলে।
তসলিমার ফোন। মামুন আমাকে ফোনসেট দিয়ে জানায়।
আমি বলি, কী হয়েছে তসলিমা।
তসলিমা বলে, আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি।
কেন?
আপনি কেন বললেন আপনার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।
কেন বললাম সেটা তো দেখলাই।
না। আপনি আপনার প্রয়োজনে কেন আমাকে নিয়ে খেলবেন। আমার কি মন বলতে কিছু নাই। আমি কি কোনো মানুষ না?

তসলি,   এটা তুমি কী বললা। তোমার মন থাকবে না কেন?   আমি তো ভিজুয়ালি ইমপেয়ার্ড,   তাই না!   আমি যদি তোমাকে না বুঝি কে বুঝবে বলো। এইভাবে বলে না।
আপনি কেন বললেন আমার সাথে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। আর আমিও তাতে হ্যাঁ বললাম। এখন?
এখন কী?
এখন তো আমার মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি আপনার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।
তসলি, শোনো। আমি যদি বিয়ে করি,   তাহলে কোনো প্রতিবন্ধীকেই করব। প্রতিবন্ধীই কেবল প্রতিবন্ধীর দুঃখ বোঝে। আমার আম্মা আমাকে একটা কিরা কাটাইছেন... আচ্ছা তুমি থাকো আমি ইডেনের সামনে আসতেছি...

৩৯.

ইডেন কলেজের সামনে যাই। সঙ্গে মামুনের মোবাইলটা। ওর রুমমেটের নাম্বারে কল দিয়া বলি তসলিমাকে একটু বলেন না গেস্ট এসেছে, আজাদ। রুমমেট তসলিমাকে সেই বার্তা পৌঁছে দেন। শুনতে পাই মোবাইলে।
শীতের সকাল হলেও রোদ বাড়ছে। পরনের সোয়েটারটা এখন ভার মনে হইতেছে। সোয়েটার খুলে ঘাড়ে রাখি।
তসলিমা আসে। বলে, আমি আসছি। বলেন কী বলবেন?
আমি বলি, তসলিমা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।
তসলিমা বলে, কী কথা?
তার কণ্ঠে মেঘ, তার কণ্ঠে জল, তার কণ্ঠে কুয়াশা।
চলো, কোথায় গিয়ে বসি। বসে বলি।
তসলিমা রাজি হয়।
আমি বলি, চলো রুজিকে সঙ্গে নেই।
চলেন। তসলিমা রুজির কথা জানে।
আমি জানাই, আমার খুব আদমজীটা দেখতে ইচ্ছা করতেছে। আদমজী এখন কেমন আছে। আদমজী এখন কীভাবে আছে। তুমি তো চিনবা না? চিনবা? রুজি রাস্তা দেখায়া নিয়া যাইতে পারবে!
আমরা একটা বেবিট্যাক্সি ভাড়া করি।
বদরুন্নেসা কলেজের হোস্টেলে যাই। রুজিকে ডেকে আনি।
আমি বলি, রুজি আদমজীতে যাইতে ইচ্ছা করতেছে। তুই আমাদেরকে রাস্তা দেখায়া নিয়া যাবি?
চলেন। রুজি এক কথায় রাজি হয়।
ওই বেবিট্যাক্সিতেই আমরা রওনা হই।
রাস্তায় বেবিট্যাক্সি গ্যাস নেয়। মনে হয়, এটা সিএনজিচালিত বেবি।
বেবি চলে হাইওয়ে ধরে। শীতের বাতাস এসে ঝাপ্টা দেয় চোখেমুখে। আরামই লাগে। আমার পাশে রুজি,   তার ওপারে তসলিমা!
আমি বলি, রুজি আমরা কোথায়?
সিদ্ধিরগঞ্জের মোড়টা আইসা গেছি। রুজি বলে।
আমি বলি,   এইখানে আমরা আসতাম রিকশা নিয়া। তারপর বাস ধরতাম। বা কলেজ থাইকা আসার সময় বাস থেকে এখানে নামতাম। তারপর রিকশা নিতাম। রিকশায় বড়জোর দশ মিনিট।
রুজি বলে, দশ মিনিট কি? পাঁচ মিনিটেও আসা যায়।
আমি বলি, রুজি রাস্তাঘাট কি আগের মতো আছে?
হ্যাঁ। সেই খাল। সেই সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন। সেই মাদ্রাসা। সেই সব ভাতের হোটেল। রুজি বর্ণনা দেয়।
আদমজীর গেটে এসে বেবিট্যাক্সি দাঁড়ায়।
এই গেটে লেখা ছিল, সংরক্ষিত এলাকা। আপনার পরিচয় দিন।
রুজি, সেই গেটটা না রে?
হ্যাঁ।
সেই সংরক্ষিত এলাকা কথাটা কি এখনো লেখা আছে?
আছে। আনসাররা গেট পাহারা দিতেছে।
আনসাররা জিজ্ঞাসা করেন, কই যাবেন?

আমি বলি, এখানে আমরা থাকতাম। এর ভেতরে আমাদের বাড়ি ছিল। ঘর ছিল। দোকান ছিল।
রুজি বলে, স্কুল ছিল।
আনসার বলে, সেইসব তো আর নাই।
রুজি বলে, জানি। তবু আমরা সেই জায়গাগুলা একটু দেখব। যাই ভেতরে?
আনসার বলে, আচ্ছা যান।
আমরা ভেতরে ঢুকি।
আমি বলি, রুজি কী দেখা যায়?
ওই যে মিলের লেবারদের কলোনিটা ওই পাশে আছে। রুজি বলে।
এই পাশের দোকানগুলা দেখা যায় না?
না, যায় না। ভেঙে ফেলছে। কী যেন বানাচ্ছে।
আমাদের স্কুটার আরেকটা চেকপোস্টে দাঁড়ায়।
আমরা নামি।
স্কুটার ফেলে রেখে আমরা হাঁটতে থাকি।
রুজি বলে, ভাইজান, ওই যে আমাদের পুরানা স্কুলটা। ওই যে আমাদের নতুন স্কুলটা, দুইটাই আছে।
আমরা হাঁটি। স্কুলের কাছে যাই।
রুজি বলে, ভিতরে পুলিশ।
আমি বলি, থাক, তাইলে আর যাই না। চল আমাদের বাসার দিকে যাই।
আমরা হাঁটি।
রুজি বলে, ভাইজান, কিছু নাই। কিছু নাই। সব ফাঁকা। আমাদের বাড়িটা নাই। ওই মার্কেটটা নাই। কোনো দোকানপাট নাই। এইটারে এখন ইপিজেড বানাইতেছে।
আমি বলি, গুড, ইপিজেডের আমাদের দরকার আছে। রপ্তানি বাড়ানো দরকার আছে।
ফাঁকা জমিন পেয়ে শীতের বাতাস হুহু করে বইতে শুরু করে। রোদটাও মরে আসতেছে। তার মানে আকাশে মেঘ।
আমার বুকের ভেতরটাতেও একটা হাহাকারের মতো বাজে।
আমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।
রুজিও মনে হয় কান্দতেছে। তার ফোঁপানির আওয়াজ আমি পাচ্ছি।
তসলিমা বলে, কী হলো আপনাদের। আমাকে এখানে আনলেনই-বা কেন। আর কান্দতেছেনই-বা কেন? আশ্চর্য তো!
আমি বলি, তসলিমা, আমরা এখানে অনেক দিন ছিলাম। এখানে ব্যবসা করে আমার আব্বা আমাদেরকে লেখাপড়া করাইছেন। আজ এই জায়গাটা কত নীরব। এইখানে আগে মিল চলত, তার আওয়াজ সারাক্ষণ কানে বাজত। সাইরেন বাজত আধঘণ্টা পরপর। তিরিশ হাজার মানুষ ছিল এখানে।
এখন জায়গাটায় কেউ নাই। বুঝলা? বলে আমি আরও হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি।
হঠাৎ রুজি বলে, ভাইজান, তালগাছের চারাটা আছে। কিছু নাই। আশ্চর্য। খালি তালগাছের চারাটা আছে।
আমি বলি, কেমনে? সবকিছু মাটির সঙ্গে মিশে গেল। তালগাছের চারাটা কেমনে আছে?
কী জানি? রুজি বলে।
মনে হচ্ছে সেই দিনের কথা। আম্মা আমাকে ফোন করে ডেকে পাঠাইছেন। আজাদ আয়। জরুরি দরকার।
একটা ট্যাক্সিভাড়া করে চলে আসি আদমজী।
কী দরকার আম্মা?
আম্মা বলেন, গন্ধ পাচ্ছিস না। তাল পিঠা বানাইতেছি। বছরকার একটা ফল। বছরকার একটা পিঠা। খাইতে হইব না?
এই তোমার জরুরি দরকার। তুমি যে কী কর না আম্মা?
আম্মা পিঠা ভাজতেছেন। বড়পা-মেজপা তাকে সাহায্য করতেছেন। আমি, রুজি, রত্না, জেসমিন বাবু সব বাইরের ঘরে টিভি দেখতেছি আর গল্প করতেছি। বিদ্যুৎ চলে যায়। আমরা আমাদের বাসার ছাদে উঠি।
রুজি বলে, ভাইজান, আকাশে চাঁদ আর সূর্য দুইটাই আছে।
আমি বলি, আজকা আমাদের খুব আনন্দের দিন। তাই চাঁদ আর সূর্য দুইটাই আছে। চল, আমরা আজকের আনন্দের

দিনে একটা ভালো কাজ করি। আমরা তালের আঁটিগুলান বাড়ির সামনের জায়গাটাতে পুঁতে দেই। গাছগুলা যখন বড় হবে, তখন দূর থাইকা আমরা গাছগুলাকে দেখব আর বলব, ওই দেখা যায় তালগাছ ওই আমাদের বাসা।

ওরা সবাই হুররে বলে ওঠে।

আমরা শাবল নিয়া নিচে যাই। আঁটিগুলা পুঁতি।

আম্মা বলেন, কয়েক দিন পরে তুলিস। দেখবি কেমন শাস হয়।

আমি বলি, না, তুলব না। গাছ বানাব।

একটামাত্র গাছ টেকে তিনটা আঁটির মধ্যে!

সেই তালগাছটা এখনো আছে!

রুজি আমাকে ধরে তালগাছ চারাটার কাছে নিয়া যায়। আমি হাত দিয়া পাতাগুলানকে বুলায়া দেখি।

ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়ি তালগাছটাকে।

আমি বলি, তসলি আমরা এক সময় সচ্ছল ছিলাম। এখন আমরা মোটামুটি নিঃস্ব। আমার ফ্যামিলিতে আম্মা অসুস্থ। আব্বা শুধু ভুল বকে আর ভুল বকে। কাজকর্ম করার মতো পরিস্থিতি আর তার নাই। চার বোন এক ভাইয়ের সংসার আমাদের। তার মধ্যে তিনজন ভিজুয়ালি ইমপেয়ার্ড।

সবাই আশা করে আছে, আমি একটা কিছু করব। আমার আম্মা আমাকে শপথ করাইছেন, স্টুডেন্ট লাইফে আমি কোনো মেয়ের সাথে জীবনটাকে জড়াব না। আমি তার মাথা ছুঁইয়া প্রমিজ করছি। তুমি কি বুঝলা?

না। আপনি কেন বললেন, আমাদের বিয়া হয়ে গেছে।

ঠিক আছে, আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এই সব নিয়ে কথা বলব আর কয়েকটা বছর পরে। আমি পড়াটা শেষ করি। নিজের পায়ে দাঁড়াই। আমার আম্মার মুখে আব্বার মুখে বোনদের মুখে একটু হাসি যদি ফোটাতে পারি! তারপর আমি কথা দিতেছি, আমি প্রমিজ করতেছি, এই রুজি সাক্ষী, আমি তোমাকেই বিয়া করব। আর কাউকে না!

'এই, আপনারা এখানে কী করেন। যান। আজকে ভিজিটর আসবে। ইপিজেডের বড় অফিসার আসবে। আপনারা যান এখান থেকে।' কে যেন ভীষণ কর্কশ স্বরে বলে।

কয়েক শ কাক কা কা করতে করতে উড়ে যায় আকাশ দিয়া। তার ছায়া এসে পড়ে আমার শরীরে। আমি টের পাই। দূরে কোথাও, এক নদীর ধারে, সমবেত শীতের পাখিদের উদ্দেশে আমার আব্বা হাঁক ছাড়েন, শুনছেন, আপনারা শুনছেন, ওই শোনা যাইতেছে আদমজী মিলের সাইরেন, মিল আবার চালু হইতে যাইতেছে, আমি আবার দোকান দিমু, হোটেলওয়ালারা ফিরা আসছে, তারা আমার পাওনা টাকা সব দিয়া যাইতেছে, আর কোনো চিন্তা নাই, বুঝছেন আপনারা...

তসলিমা বলে, আপনি কি আমার হাতটা একটু ধরবেন।

আমি হাত বাড়ায়া তসলির হাত ধরি। হাতটা খুঁজে পাইতে আমার অসুবিধা হয় না!